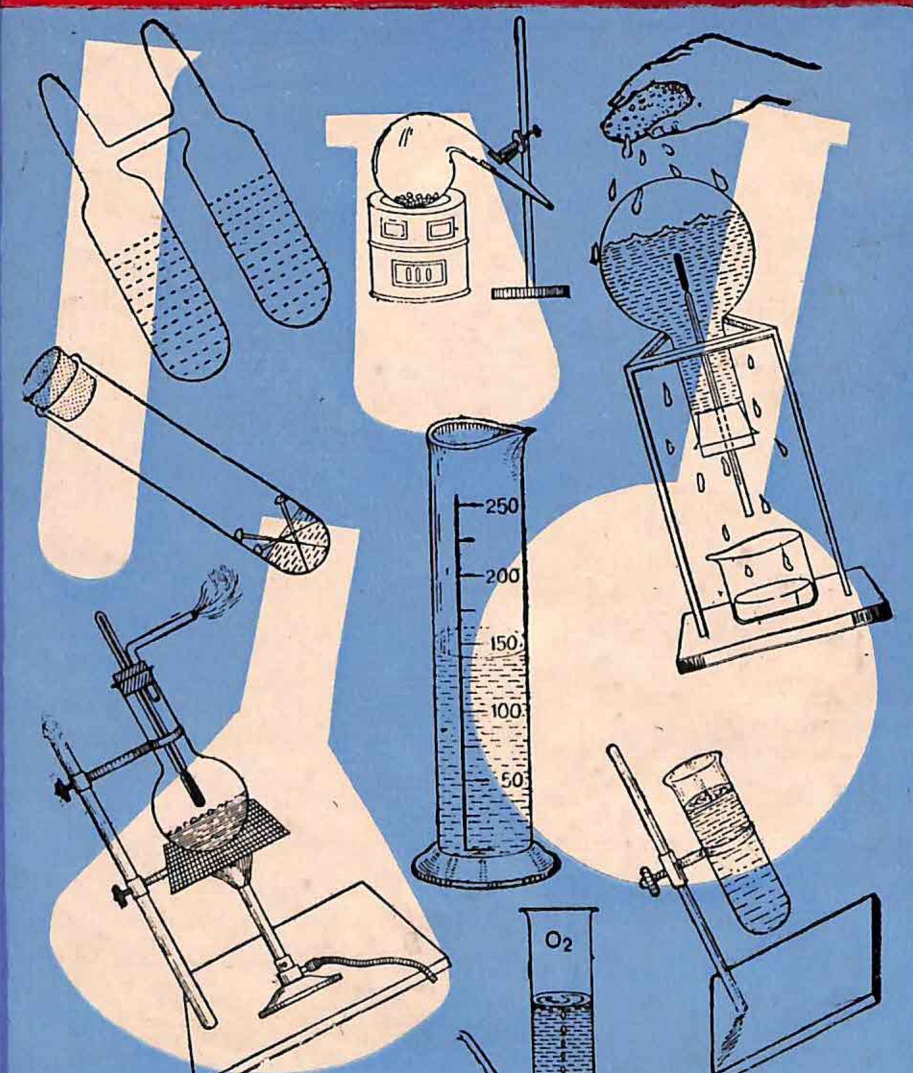
হাতে কলমে

রসায়ন



কমল চক্রবর্তী

হাতে-কলমে রসায়ন

কমল চক্রবর্তী-এম. এস. সি., বি. এড, পি. এইচ. ডি.

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্যকলেজের রসায়নের বিভাগীয় প্রধান ;
প্রাক্তন লেকচারার, রামকৃষ্ণমিশণ শিক্ষক-শিক্ষণ
কেন্দ্র, বেলুড় ।

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

Hate-Kalame Rasayana by Kamal Chakraborty

প্রকাশক ঃ
দুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিণ্টার্স
সত্যনারায়ণ মণ্ডল
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

উৎসর্গ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে

লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞানের ছড়া

বিজ্ঞান বিচিত্রা

বিজ্ঞান ভাবনা

জ্ঞানের আসর

অঙ্ক কষা সহজ

নিবেদন

বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পাঠ্য বইতে নানা পরীক্ষার কথা পড়ে কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে সব পরীক্ষাগুলো তারা নিজেরা হাতে-কলমে করার সুযোগ পায় না। কোন পরীক্ষা করার সময় বাস্তব যে সব সমস্যায় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে, সেগুলি সম্বন্ধে পাঠ্যবইতে ততটা বিশদভাবে সাধারণত লেখা থাকে না। এছাড়া সেসব কাজ করতে গেলে কি পরিমাণ বস্তু প্রয়োজন তাও সবসময় লেখা থাকে না। তাই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব সমস্যা দূর করতে ও কাজে আনন্দ যোগাতে এই ধরনের বই লেখার চেষ্টা করলাম। যদি বইটি পড়ে তারা সতি-সত্যিই পরীক্ষাগুলো করতে পারে, তবে বুঝব আমার লেখা সার্থক। রসায়ন শাস্ত্রে নানা পরীক্ষা করার সুযোগ আছে এবং আমি রসায়নের শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের যদি কোন রকম সাহায্য করতে পারি, তবে নিজে গর্ববোধ করতে পারব। এ ধরনের বই করার ব্যাপারে প্রকাশক শ্রীদুলাল বলের আগ্রহ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।

বইটির মান উন্নয়নে পাঠকের সুচিন্তিত মতামত জানালে খুশী হব।

কমল চক্রবর্তী

সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ
কলিকাতা-৯
১৫।৭।৮৭

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

'হাতে কলমে' পরীক্ষা করলে কোন কাজ সম্বন্ধে ধারণা অনেক পাকাপোক্ত হয়, অথচ সেই কাজের সম্বন্ধে শুধুমাত্র উপদেশ কাজের ওপর ধারণাকে বলিষ্ঠ করতে পারে না। ধরা যাক, আলো কি তা বোঝাতে গিয়ে যদি শুধুই বক্তৃতা করা যায়, তবে তা ছাত্রদের মনে যে দাগ কাটবে, তার থেকে যদি সুইচ অন করে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় তবে তা অনেক বেশি কার্যকর হবে।

বিজ্ঞানের কোন ধারণাকে সম্পূর্ণ করতে সেজন্য চাই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা ছাত্ররা যত বেশি নিজ হাতে করতে পারবে ততই বিষয়টি সম্বন্ধে তাদের ধারণা বলিষ্ঠ হবে। কোন পরীক্ষা করে যে ফলাফল পাওয়া যায়, তা কেন পাওয়া যায় সেটা জানতে সাহায্য করে বিজ্ঞান-ভিত্তিক মন।

গবেষক বা ছাত্র বিজ্ঞানের নানাবিধ পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরীতে। পরীক্ষা করতে গিয়ে গবেষকরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হন, সেগুলো তাঁরা দূর করার চেষ্টা করেন। এরজন্য একই পরীক্ষা বারে বারে করার প্রয়োজন হয়। কোন পরীক্ষায় সফলতা পেতে হলে চাই ধৈর্য ও কাজে আগ্রহ। ছাত্ররা প্রথমে তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে কাজ শিখে নেবে ও তারপর নিজ হাতে সেইসব কাজ করবে। কাজ করতে গিয়ে তারা দেখতে পাবে যে পাঠ্যপুস্তকের লেখার সঙ্গে বাস্তব পরীক্ষার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। পরীক্ষা হাতে হাতে করলে একটি বস্তুর বেশ কয়েকটি রাসায়নিক ধর্ম সে সহজেই মনে রাখতে পারবে এবং ধর্মগুলি তার ভাল মনে থাকবে। একটি বস্তুর (বিক্রিয়ক) সঙ্গে অন্য বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি কি পরিবর্তন ঘটছে তার কিছু কিছু অনেক সময় বোঝা যায়। কোন বস্তু জলে দ্রবণীয় কিনা তা জানার জন্য বস্তুটি জলে মিশিয়ে

নাড়িয়ে দিলেই তা জানা হয়ে যায়, অথচ বই পড়ে মুখস্ত রাখতে গেলে, তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অ্যামোনিয়া গ্যাসটি তৈরি করতে একটি ছাত্র যদি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও চুণ মিশিয়ে গরম করে তবে তার গ্যাসপ্রস্তুতিটা খুব সহজেই মনে থাকবে। ঐ গ্যাসের গন্ধ কেমন সে জানতে পারবে, এছাড়া আরও কিছু কিছু পরীক্ষা করে সে গ্যাসের কয়েকটি ধর্মও জানতে পারবে।

এখন এইসব পরীক্ষা সে স্কুলের ল্যাবরেটরীতে বসে করতে পারে। যদি সে বিভিন্ন পরীক্ষা ভালভাবে শিখতে পারে, তবে তার নিজের ওপর আস্থা বেড়ে যাবে। এখন, রসায়নের বেশ কিছু মজার মজার পরীক্ষা ঘরে বসেও করা যায়। এর জন্য কোন ছাত্রকে, মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য চেয়ে আনতে হবে অথবা দোকান থেকে অল্প কিছু জিনিস কিনে আনতে হবে। বাড়িতে বসে কাজ করলে, অনেক মজার মজার ঘটনা দেখা সম্ভব। তবে কাজ করতে গেলে যে রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহার করতে হবে সেগুলো সম্বন্ধে কিছু ধারণা আগে থেকেই রাখতে হবে। কাজ করতে গেলে যে যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে (বইয়ের শেষে উল্লেখ আছে) সেগুলো সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে।

'হাতে কলমে' বিভিন্ন পরীক্ষা যদি ঠিকভাবে তোমরা করতে পারো তবে ঐ সব পরীক্ষায় শুধুমাত্র আনন্দই পাবে না, বিজ্ঞানের অনেক তথ্যও জানতে পারবে। এইসব তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে কোন কোন জিনিস যেমন—সাবান, ফেনল, মলম প্রভৃতি নিজেরা বেশি পরিমাণে তৈরি করতে পারবে। এমনকি এই দেশের বেকারত্বের যুগে নিজহাতে কিছু বানিয়ে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

ভাল লাগবে অথচ নিজেরাও করতে পারবে এমন বেশ কিছু পরীক্ষা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এইসব পরীক্ষা করতে গেলে যেসব জিনিস প্রয়োজন সেগুলি কোথায় পাওয়া যাবে

তা জানার জন্য কয়েকটি দোকানের নাম ও ঠিকানা বইয়ের শেষের দিকে দিয়ে দিয়েছি।

কোন পরীক্ষা আরম্ভের আগে উপকরণগুলি সব যোগাড় করে নেবে এবং পরীক্ষা পদ্ধতিটা ভাল করে পড়ে নেবে।

অনেকগুলি পরীক্ষা করার সময় তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেজন্য তোমাদের বার্নার বা স্টোভের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল ঘরে যে গ্যাস সিলিণ্ডার (L. P. G.) ব্যবহার করা হচ্ছে তার সঙ্গে বুনসেন বার্নার যোগ করে গরম করার ব্যবস্থা করতে পারো অথবা ব্লো বার্নার ব্যবহার করতে পারো। অল্প গরম করার জন্য স্পিরিট ল্যাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে।

[এক] ভ্যানিশিং রঙ প্রস্তুত পদ্ধতি

দোল খেলার সময় তোমরা একটা রঙ তৈরি করতে পার। রঙটি এমনই মজার যে এটি সাদা জামার ওপর ঢেলে দিলে জামার রঙ বেগুনি বা লালচে হয়। এর কিছুক্ষণ পরে রঙটি আবার চলে যায় অথচ জামাও ঠিক থাকে। কি করে রঙটা তৈরি করবে, তা বলি। নিচের দুটো পদ্ধতিতেই এটা তৈরি করা যায়।

প্রথম পদ্ধতি

উপকরণ : (i) 100 সিসি অ্যালকোহল (ii) ফেনপথ্যালিন নির্দেশক (2 গ্রাম) (iii) লিকার অ্যামোনিয়া দ্রবণ (iv) কয়েকটি বোতল।

প্রস্তুত-পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ : 2 গ্রাম মত ফেনপথ্যালিন 100 সিসি অ্যালকোহলে গুলে ফেল এবং এই দ্রবণটি 200 সিসি মত লিকার অ্যামোনিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দাও। এতে মিশ্রণ দ্রবণটি বেগুনি রঙের হয়। মিশ্রণ দ্রবণ ভাল করে ঝাঁকিয়ে একটি বোতলে রাখ। বোতলের মুখটি টাইট করে ছিপি দিয়ে বন্ধ কর।

এইভাবে ভ্যানিশিং রঙ তৈরি হয়। এটি সাদা জামা-কাপড়ে ছিটিয়ে দিলে, পোষাকটি বেগুনি রঙের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে তা আবার সাদা রঙ ফিরে পায়। কেন এমন হয় ?

অ্যামোনিয়া একটি ক্ষারীয় দ্রবণ। এর মধ্যে ফেনপথ্যালিন নির্দেশক দিলে, ক্ষারীয় দ্রবণের বর্ণ বেগুনি হয়। এটি জামায় ছিটিয়ে



ছেলেটি পিচকিরি দিয়ে ভ্যানিশিং রঙ দিচ্ছে

দিলে জামার রঙ বেগুনি হয়। কিছুক্ষণ পরে অ্যামোনিয়া বেরিয়ে গেলে, জামা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

সতর্কতা ঃ অ্যামোনিয়া খুব ঝাঁঝাল ও শ্বাসরোধী। চোখের পক্ষেও খুব ক্ষতিকর। সুতরাং এটি নিয়ে সাবধানে কাজ করবে।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ ফেনপথ্যালিন মেশানো অ্যামোনিয়ার দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া উবে গেলে দ্রবণটি তার বেগুনি বর্ণ হারায়। অ্যালকোহলে অ্যামোনিয়া মেশালে, অ্যামোনিয়া তাড়াতাড়ি উবে যায় ও পরীক্ষাটি আরও সুন্দর হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

উপকরণ : (i) কাচের বোতল (ii) ফেনপথ্যালিন নির্দেশক (iii) অ্যালকোহল (iv) চুণের জল।

প্রস্তুত পদ্ধতি : 100 গ্রাম মত কলিচুণ 2·5 লিটার জলে ভিজিয়ে দাও। একদিন পরে চুণ জলের দ্রবণটি ভাল করে ছেঁকে নাও। এই দ্রবণের 1 লিটারের সঙ্গে ফেনপথ্যালিনের দ্রবণ মিশিয়ে দাও। (আগের মত এখানেও 2 গ্রাম মত ফেনপথ্যালিন নির্দেশক 100 সিসি অ্যালকোহলে গুলে নাও)। এইভাবে যে ভ্যানিশিং রঙ তৈরি হয়, তা অ্যামোনিয়া দিয়ে তৈরি রঙের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। তবে এই পদ্ধতিতে তৈরি রঙ, জামা কাপড় থেকে উবে চলে যেতে বেশি সময় নেয় এবং চুণ ব্যবহার করার ফলে, এই রঙ তৈরিতে খরচ কম হয়।

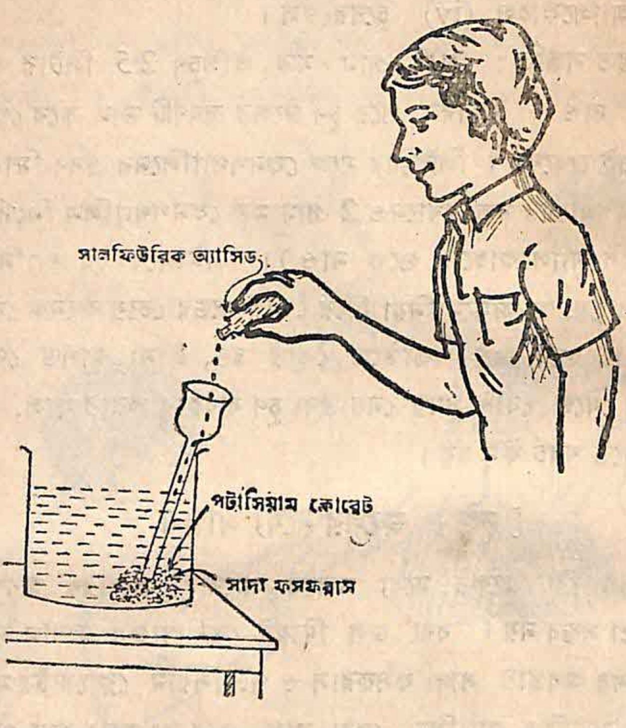
[দুই] জলের মধ্যে আগুন

আগুন কি জলের মধ্যে জ্বলতে পারে? সাধারণ অবস্থায় কখনই তা সম্ভব নয়। বরং জল দিয়েই তো আগুন নেভান হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় সাদা ফসফরাস ও পটাসিয়াম ক্লোরেটের মধ্যে যদি সালফিউরিক অ্যাসিড দেয়া যায়, তবে তা সম্ভব হয়ে ওঠে। এর জন্য চাই কয়েকটি জিনিস।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) কয়েক টুকরো সাদা ফসফরাস (ii) পটাসিয়াম ক্লোরেট (iii) একটি বড় বীকার (iv) লম্বা-নলাকার ফানেল (v) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড। (vi) একটি চামচ বা চিমটে।

কর কাজ, রাখ নজর : একটি বড় বীকারের অর্ধেকটা জলে ভর্তি কর। এরপর একটা চামচ দিয়ে কয়েক টুকরো সাদা ফসফরাস বীকারের এক কোণে রাখ। এবার লম্বা নলাকার ফানেল দিয়ে ওর ওপর পটাসিয়াম ক্লোরেট মিশিয়ে দাও। এই দুটি পদার্থের ওপর

ঐ লম্বাকার ফানেলটি দিয়ে ধীরে ধীরে সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখবে জলের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে।



জলে আগুন জ্বালান হচ্ছে

সিদ্ধান্ত : ফসফরাস, পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) ও সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে।

সর্তকতা : (i) ফসফরাস হাত দিয়ে ধরবে না, কারণ এটি বিষ। (ii) সালফিউরিক অ্যাসিড সাবধানে অল্প অল্প করে ঢালবে।

প্রয়োজনীয় কথা : সালফিউরিক অ্যাসিড জলে মিশলে জল গরম হয়ে ওঠে। ঐ উত্তাপে ফসফরাস, $KClO_3$ এর দ্বারা জারিত হয়ে যায়। আর একটি উপায়েও জলের নিচে আগুন জ্বালান যেতে পারে। এর জন্য একটি মোটা টেস্টটিউবে সাদা ফসফরাস নাও এবং

তাতে অল্প জল দাও। এরপর টেস্টটিউবটি একটি জলপূর্ণ বীকারে বসিয়ে দাও। বীকারটি একটু গরম কর। একটি নল দিয়ে ফসফরাসের ওপর অক্সিজেন পাঠাবার ব্যবস্থা কর, দেখবে ফসফরাস জ্বলে উঠছে।

[তিন] সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি

ফ্যাক্টরীর বড় বড় চোঙের সাদা ধোঁয়া বেরতে তোমরা দেখেছ। তোমরাও ইচ্ছে করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করতে পারো। এই ধোঁয়া সৃষ্টি করতে হলে অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে পরস্পর কাছাকাছি আনতে হবে।



লাইকার অ্যামোনিয়া লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

গ্লাসভর্তি সাদা ধোঁয়া

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) লাইকার অ্যামোনিয়া (গাঢ় অ্যামোনিয়ার দ্রবণ)। (ii) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। (iii) দুটি একই মাপের কাচের গ্লাস। (iv) গ্লাস ঢাকার দুটি ঢাকনা।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ : একটা কাচের গ্লাস নাও এবং তার মধ্যে অল্প পরিমাণ লাইকার অ্যামোনিয়া (10—15 সিসি) ঢাল। অ্যামোনিয়ার দ্রবণ দিয়ে গ্লাসের ভেতরটা ধুয়ে ফেল এবং গ্লাসটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ। এরপর অন্য কাচের গ্লাসে কিছুটা লঘু HCl ঢেলে, ভেতরটা ধুয়ে ফেল। এতে গ্লাসের সারা

গায়ে HCl-এর দ্রবণ লেগে থাকবে। এই গ্লাসটাকেও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দাও। এবার অ্যামোনিয়ায় ধোওয়া গ্লাসের মুখে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ধোওয়া গ্লাসটা উপুর করে বসাও যাতে ছটো গ্লাস মুখোমুখি থাকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখতে পাবে ঘন সাদা ধোঁয়ায় গ্লাস ছটো ভরে গেছে।

সিদ্ধান্ত : অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পরস্পর বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি করে।

সতর্কতা (i) গাঢ় অ্যামোনিয়া চোখ ও নাকের কাছে আনবে না। এতে চোখ জ্বালা করে ও হঠাৎ দম বন্ধ হবার মত অবস্থা হয়।

(ii) অ্যামোনিয়ায় ধোওয়া গ্লাসটা নিচে ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ধোওয়া গ্লাস ওপরে রাখবে।

প্রয়োজনীয় কথা : অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি করে। এই উৎপন্ন পদার্থটির জন্যই সাদা ধোঁয়া তৈরি হয়।

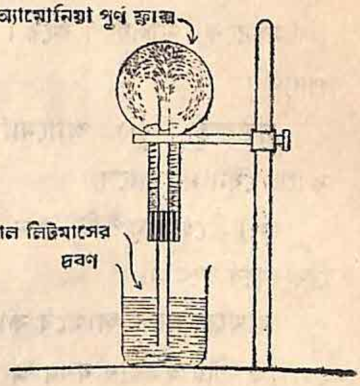
ওপরের পরীক্ষা থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, অ্যামোনিয়া বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা।

[চার] ঝর্ণা পরীক্ষা

ঝর্ণা তোমরা অনেকেই দেখেছ। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা যে নিচের দিকে নেমে আসে তা কে না জানে! আজ তোমাদের এমন এক ঝর্ণার কথা বলব যা ওপর থেকে নিচে নয়, বরং উল্টো পথে অর্থাৎ নিচ থেকে ওপরে ওঠে। নিচের দেওয়া পরীক্ষাটা করে ঝর্ণা তৈরির কাজটা তোমরা নিজেরা সহজেই করতে পারবে। পরীক্ষাটা ভালভাবেই হয়, কারণ জলে অ্যামোনিয়া গ্যাসের দ্রবণীয়তা খুব বেশি। এর জন্য তোমাকে কয়েকটি জিনিস যোগাড় করে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যঃ (i) একটি গোলতল কূপী (ii) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (iii) চুণ (iv) বার্নার (v) লাল লিটমাস দ্রবণ (vi) কূপী আঁটবার স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্প (vii) বড় বীকার (viii) একটি মোটা টেষ্ট টিউব।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণঃ 10 গ্রাম মত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং 25 গ্রাম কলিচুণ একটি বীকারে ভাল করে মেশাও। মিশ্রণটি এরপর একটি শক্ত মোটা টেস্ট টিউবে নাও। টেস্ট টিউবের মুখে কর্ক লাগাও।



ঝর্ণার সৃষ্টি

কর্কের মধ্যে একটি বাঁকা নির্গম নল লাগাও এবং নির্গম নলের একটি প্রান্ত উপুড় করা একটি গোলতল কূপীর মধ্যে ঢোকাও। মিশ্রণটি বার্নার দিয়ে গরম কর। এতে গোলতল কূপীতে অ্যামোনিয়া গ্যাস এসে জমা হয়। ইচ্ছে করলে দু'-তিনটে গ্যাসজারে অ্যামোনিয়া গ্যাস ভরে মুখগুলো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে পার। এবার একটি বীকারে লাল লিটমাস দ্রবণ নাও এবং অ্যামোনিয়া পূর্ণ কূপীতে স্টপককযুক্ত একটি সূচল মুখের ফানেল লাগাও এবং সেটি লিটমাস দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। অ্যামোনিয়া পূর্ণ কূপীটা ঠাণ্ডা জল দিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা কর। এতে কিছুটা লিটমাসের দ্রবণ ওপরে অ্যামোনিয়ার কূপীতে এসে পড়বে। এবার সরু কাচনলের মুখটা আঙ্গুল চেপে ফ্লাস্কটা ভাল করে নাড়িয়ে নাও এবং আবার লিটমাসের জলে মুখটা ঢুকিয়ে আঙ্গুল সরিয়ে নাও। দেখবে, লাল লিটমাস দ্রবণ সবেগে ফোয়ারার মত ওপরের ফ্লাস্কে উঠে আসছে এবং লাল লিটমাস দ্রবণ অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে এসে নীল দ্রবণে পরিণত হচ্ছে। অ্যামোনিয়া জলে তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং

সেই স্থান পূর্ণ করার জন্য নিচের লিটমাস দ্রবণ ছুটে আসে ও ঝর্ণার মত দেখায়।

সিদ্ধান্ত ঃ অ্যামোনিয়া জলে অত্যধিক দ্রবণীয় এবং লাল লিটমাসকে নীলবর্ণ করে। অর্থাৎ অ্যামোনিয়া একটি ক্ষারীয় পদার্থ।

সতকর্তা ঃ (i) অ্যামোনিয়া শ্বাসরোধী, সুতরাং গ্যাসটি নাকের কাছে যেন না আসে।

(ii) গোলকূপীটি যেন অ্যামোনিয়া পূর্ণ হয়, নতুবা পরীক্ষাটি ঠিকভাবে হবে না।

রাখলে মনে, লাগবে কাজে ঃ অ্যামোনিয়া গ্যাস জলে খুব বেশি দ্রবণীয় হওয়ায় যখন অল্প জল নিয়ে ফ্লাস্কটা ভাল করে ঝাঁকান হয় তখন অনেকটা অ্যামোনিয়া জলে গুলে যায় ও ফ্লাস্কে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য লাল লিটমাসের দ্রবণ কূপীতে ঝর্ণার বেগে ছুটে আসে। কূপীতে অ্যামোনিয়া থাকায় লাল লিটমাসের জল নীল রঙে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া (জলীয় দ্রবণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়েছে) একটি ক্ষারীয় পদার্থ। যেহেতু ক্ষারীয় পদার্থ লাল লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত করে, সেইজন্য লাল লিটমাস দ্রবণ নীল রঙে পরিণত হয়েছে। কূপীটি অ্যামোনিয়া পূর্ণ হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য কূপীর মুখের কাছে একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ভেজানো কাচ নল ধর। যদি সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, তবে বুঝবে কূপীটি অ্যামোনিয়া পূর্ণ হয়েছে। সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হয় অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি হয়, তার জন্য।

এই পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ হল, যে অ্যামোনিয়া জলে খুব দ্রাব্য। সুতরাং জলের অপসারণ দিয়ে গ্যাসটি সংগ্রহের চেষ্টা কখনই করবে না। শুষ্ক গ্যাস পাওয়ার জন্য ফসফরাস পেন্টোক্সাইড, অনার্দ্র

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যায় না। কারণ গ্যাসটি এগুলির সঙ্গে বিক্রিয়া করে। অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে গ্যাসটি যুত-যৌগ ($CaCl_2, 8NH_3$) গঠন করে। আবার সালফিউরিক অ্যাসিড ও ফসফরাস পেণ্টোক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গ্যাসটি যথাক্রমে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট লবণ গঠন করে। জলীয় বাষ্প শোষণ করার জন্য পরীক্ষাগারে গ্যাসটিকে একটি চুণভর্তি টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে পাঠান হয় এবং তারপর গ্যাসটি সংগ্রহ করা হয়।

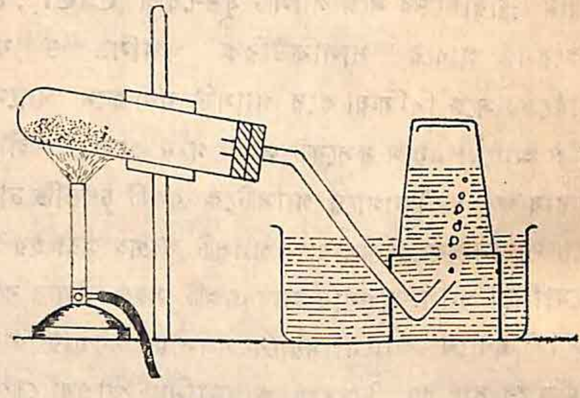
অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়ার আর একটি সহজ উপায় বলে রাখি এ প্রসঙ্গে। এখানে অ্যামোনিয়াকে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রয়োজন। তাই সহজভাবে সাধারণ উষ্ণতায় অ্যামোনিয়া পাওয়া যেতে পারে যদি লিকার অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ও কিছু কঠিন কস্টিক সোডা যোগাড় করা যায়। একটি গোল কূপীতে কস্টিক সোডার মধ্যে লিকার অ্যামোনিয়া দিয়ে কূপীর মুখে উল্টো করে একটি গ্যাসজার ধরলে, অল্প সময়েই গ্যাসজারটি অ্যামোনিয়া গ্যাসে ভর্তি হয়ে যাবে। এইভাবে কয়েকটি গ্যাসজার ভর্তি করতে পার। যদি গরম করার কোন ব্যবস্থা না থাকে তখন এই ভাবেই অ্যামোনিয়া গ্যাস সংগ্রহ করে কাজ মেটাতে পার।

[পাঁচ] অক্সিজেন প্রস্তুতির সহজ পদ্ধতি

ল্যাবরেটারিতে যে পদ্ধতিতে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়, সেভাবেই এখানে তৈরি করা হবে, তবে কিছুটা সহজভাবে। এই অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে গ্যাসটার ধর্ম কি।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) একটি শক্ত টেস্ট টিউব (ii) 3-4 টে কাচের গ্লাস ও ঢাকনা (iii) পটাসিয়াম ক্লোরেট (25 গ্রাম)

(iv) ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড (v) বার্নার (vi) স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্প। (vii) বড় গামলা (viii) জল।



অক্সিজেন প্রস্তুতি দেখান হচ্ছে

পরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ : একটি শক্ত মোটা টেস্ট টিউব নাও। এখন 20 থেকে 25 গ্রাম মতো পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং 5 গ্রাম মতো ম্যাঙ্গানীজ ডাই অক্সাইড নিয়ে সাবধানে মেশাও এবং তারপর মিশ্রণটিকে ঐ টেস্ট টিউবে নাও। এবার ছবির মত করে টেস্ট টিউবটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাও। টেস্ট টিউবটার খোলা মুখ একটু যেন নিচের দিকে হেলান অবস্থায় থাকে। টেস্ট টিউবের মুখ কর্ক দিয়ে আটকাও এবং কর্কের ভেতর ফুটো করে একটা বাঁকা কাচ নল ঢোকাও। কাচ নলের অন্যপ্রান্ত গামলার মধ্যে রাখ। গামলা ভরে জল রাখ। এরপর, কাচনলের মুখটির ওপর জলভরা কাচের গ্লাস উল্টে রাখ। এবার মিশ্রণটি বার্নার দিয়ে গরম কর। যখন উষ্ণতা প্রায় 250°C হবে তখন পটাসিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড এর মিশ্রণ থেকে অক্সিজেন গ্যাস বেরোতে শুরু করবে। বাঁকা নল থেকে গ্যাস যখন গামলার জলে বুদবুদ কাটবে তখন জল ভরা কাচের গ্লাস উপুর করে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে কাচের গ্লাস অক্সিজেন গ্যাসে ভরে যাবে। গ্লাসটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দাও। এইভাবে 3 থেকে 4 গ্লাস অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ কর।

সতকর্তা :—(i) শক্ত কাচ নলে $KClO_3$ ও MnO_2 এর মিশ্রণ দেবার আগে এই তুটির মিশ্রণের অল্প একটু নিয়ে অন্য একটা টেস্ট টিউবে গরম করে দেখ যে কোন রকম বিস্ফোরণ ঘটে কিনা। যদি বিস্ফোরণ না হয়, তবেই শক্ত কাচ নলে ঐ মিশ্রণ দেবে। MnO_2 তে অনেক সময় কার্বনের গুঁড়ো মেশান থাকে এবং এই কার্বন, $KClO_3$ এর সংস্পর্শে গরম অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটায়। সুতরাং MnO_2 যেন কার্বন মিশ্রিত না হয়।

(ii) টেস্ট টিউবটি ($KClO_3$ ও MnO_2 এর দ্বারা) অর্ধেকের বেশি ভর্তি করবে না।

(iii) শক্ত মোটা টেস্ট টিউবটির মুখটি যেন সামান্য নিচের দিকে কাত করা থাকে এবং টেস্ট টিউবটি যেন একটু আলগা করে ক্ল্যাম্প করা থাকে, নইলে গরম করলে টিউবটিতে ফাটল ধরতে পারে।

(iv) কর্ক এবং নির্গম নলটি যেন বায়ুরুদ্ধ করে লাগানো হয়। মোম দিয়ে বায়ুরুদ্ধ করে নিতে পার।

(v) গরম করার সময় বার্নারটাকে নিজের আয়ত্বে রাখতে হবে যাতে সমস্ত মিশ্রণটি ঠিকভাবে সবসময় গরম থাকে।

(vi) গ্যাস সংগ্রহ হবার পর নির্গম নলের প্রান্তটি জল থেকে সাবধানে সরিয়ে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় কথা : শীলি, প্রীস্টলী এঁরা তুজনে পৃথক-ভাবে অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। কিন্তু এর রাসায়নিক ধর্ম ও ব্যবহার নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন ল্যাভয়সিয়র। ওপরের বিক্রিয়াতে যদি MnO_2 ব্যবহার করা না হয়, তবে শুধু $KClO_3$ থেকেও অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব, তবে সেক্ষেত্রে $KClO_3$ কে 630° সেন্টিগ্রেডে গরম করতে হবে।

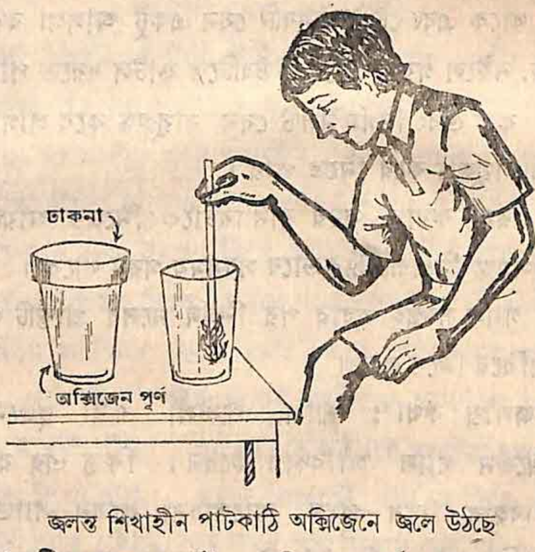
একটি উলফ্ বোতলে ব্লিচিং পাউডারের সঙ্গে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সহজেই অক্সিজেন উৎপন্ন করা যায়।

জলের গভীরে যেতে, পাহাড়ে উঠতে বা রোগীর শ্বাসকষ্টের সময়

অক্সিজেন দরকার হয়। এজন্য অক্সিজেন পূর্ণ সিলিণ্ডার ঐসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণে এটির প্রয়োজন। বায়ুতে শতকরা 21 ভাগ এটি থাকে। তবে যত ওপরে ওঠা যায়, এর শতকরা পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসে।

[ছয়] অক্সিজেন অদাহ্য কিন্তু দহনের সহায়ক

আগের পরীক্ষায় অক্সিজেন প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে এবং কয়েকটি কাচের গ্লাসে অক্সিজেন ভরা হয়েছে। এবার দেখান হবে অক্সিজেন নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে।



জ্বলন্ত শিখাহীন পাটকাঠি অক্সিজেনে জ্বলে উঠছে

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) অক্সিজেন পূর্ণ কাচের গ্লাস।
(ii) পাটকাঠি এবং দেশলাই।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ : পাঠকাঠিটি দেশলাই দিয়ে ধরাও এবং তারপর ফুঁ দিয়ে তার শিখা নিভিয়ে দাও। পাটকাঠিটি জ্বলবে কিন্তু শিখা থাকবে না। এমন অবস্থায় সেটি অক্সিজেনপূর্ণ কাচের গ্লাসে ঢোকাও। পাটকাঠিটা আবার শিখাসহ জ্বলে উঠবে।

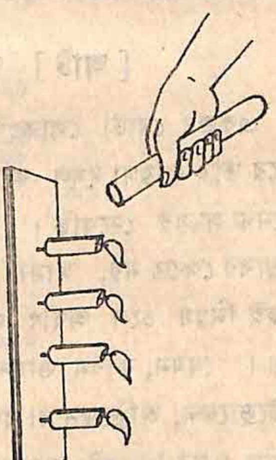
সিদ্ধান্ত : অক্সিজেন একটি অদাহ্য গ্যাস কিন্তু দহনে সাহায্য করে।

প্রয়োজনীয় কথা : কার্বন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি অধাতুও অক্সিজেনে দহন হয়। দহনের ফলে ঐ সব মৌলের অক্সাইড উৎপন্ন করে। অক্সাইডগুলি জলে গুলে গিয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

[সাত] গ্যাস ঢেলে আগুন নেভানো

বায়ুর চেয়ে ভারী এমন একটা গ্যাস হচ্ছে কার্বন-ডাই অক্সাইড। এটি সহজেই সংগ্রহ করা যায় এবং এটি এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালা যায়। যেন একটি পাত্র থেকে জল ঢেলে অন্য পাত্রে রাখা হচ্ছে। দহনে সাহায্য করে না ও বায়ুর চেয়ে ভারী বলে গ্যাসটিকে আগুন নেভানোর কাজে লাগান হয়। গ্যাসটির প্রকৃতি আম্লিক অর্থাৎ এটি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটি অম্ল উৎপন্ন করে। নিচের মত করে পরীক্ষা করে এর ধর্মগুলো সহজেই তোমরা যাচাই করে নিতে পারো।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) টেফলনের কিপযন্ত্র (ii) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (iii) চুণাপাথর (iv) 2টি কাচের গ্লাস (v) ঢাকনা (vi) একটি কার্ড-বোর্ড (vii) 4 টে মোমবাতি (viii) কয়েকটি পিন (ix) দেশলাই (x) নীল লিটমাস কাগজ।



মোমবাতির শিখার উপর গ্যাস ঢালা হচ্ছে

যেভাবে পরীক্ষা করবে : আগুন নেভানো যন্ত্র (পরীক্ষা নং আট) আলোচনায় কিপযন্ত্র থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইডের প্রস্তুতির

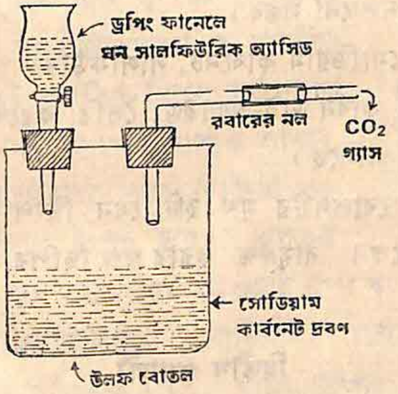
কথা যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেইভাবে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসটি প্রস্তুত কর এবং গ্যাসটি দু'টো কাচের গ্লাসে ভরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখ। এবার একটি কার্ডবোর্ডে চারটে পিন পুঁতে প্রতি পিনের ওপর একটি করে মোমবাতি আটকে দাও। এরপর কার্ডবোর্ডটাকে দাঁড় করিয়ে ওপর থেকে এক গ্লাস ভর্তি কার্বন-ডাই অক্সাইড আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। দেখবে একটা একটা করে মোমবাতি নিভে যাচ্ছে। এবং আর একটা পরীক্ষা কর। একটি নীল লিটমাস কাগজ জলে ভিজিয়ে অন্য গ্লাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও (এই গ্লাসটিও কার্বন-ডাই অক্সাইড দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে)। দেখবে, নীল লিটমাস কাগজটা লাল হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ওপরের পরীক্ষা থেকে তোমরা জানতে পারলে যে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসটি বায়ুর চেয়ে ভারী ও দহনে সহায়ক নয়। এবং গ্যাসটি আম্লিক।

[আট] আগুন নেভানো যন্ত্র

একজন মোটা লোক সহজেই একজন রোগা লোককে ধাক্কা মেরে তার জায়গা দখল করে নিতে পারে। এরকম ঘটনা আমরা অনেক সময়ই দেখেছি। অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, আমরা যে বায়ুমণ্ডলে বাস করি সেখানেও সেই একই নিয়ম চলে অর্থাৎ ভারী গ্যাস হাল্কা গ্যাসকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। যেমন, কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি ভারী গ্যাস—এই গ্যাস হাইড্রোজেন, অক্সিজেন বা বায়ুকে সহজে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করতে পারে। এই গুণের জন্য এই গ্যাসকে আগুন নেভানোর কাজে লাগান যায়। তবে এটাই এই গ্যাসের আসল গুণ নয় আসল গুণটা হচ্ছে, গ্যাসটা নিজে জ্বলে না এবং অন্যকেও জ্বলতে সাহায্য করে না। এইসব গুণের জন্যই গ্যাসটি আগুন নেভানোর কাজে লাগান যায়।

মোচার মত দেখতে লাল রঙের আগুন নেভানোর যন্ত্র—সিনেমা হল, অফিস প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। এই যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা করা থাকে যাতে সহজে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করা যায়। যন্ত্রটির মধ্যে একটি কাচের নল থাকে যার মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড রাখা হয়। যন্ত্রের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেটের গাঢ় দ্রবণ রাখা হয়। যন্ত্রটির বাইরে একটা হাতল থাকে। যখন প্রয়োজন হয় তখন হাতলটিকে আঘাত করতে হয় এবং তাতে ভেতরের কাচনলটি ভেঙ্গে যায়। কাচনল দিয়ে তখন সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে এসে সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং তার ফলে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। প্রচণ্ড চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল বেরিয়ে আসে আর তাতেই আগুন নিভে যায়। এই পদ্ধতিকেই আরো সহজভাবে কাজে লাগান যেতে পারে। এরজন্য কয়েকটি জিনিস যোগাড় কর এবং নিচের মত পরীক্ষা কর।



আগুন নেভানোর জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) দু'মুখের (উলফ বোতল) কাচের বোতল। (ii) দুটো রবারের ছিপি (iii) একটি কাচের বাঁকান নল (iv) একটি বড় ড্রপিং ফানেল, (iv) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (v) কাপড় কাচা সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণ।

প্রথম প্রণালী

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ঃ উলফ বোতলের একটি মুখে বিন্দুপাতী ফানেল (ড্রপিং ফানেল) লাগাও। বোতলের ভেতর সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণ রেখে বোতলের অন্য মুখটি এবার কর্ক দিয়ে আটকে দাও। এই কর্কের ভেতর দিয়ে একটি বাঁকা কাচনল (নির্গম নল) লাগাও। কাজের সুবিধের জন্য, কাচের নলটির সঙ্গে রবারের নল জুড়ে আবার কাচনল লাগিয়ে নাও। এতে নির্গম নলটিকে ইচ্ছেমত ঘোরান যাবে। এখন বিন্দুপাতী ফানেলের মধ্যে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড নাও। এবার প্রয়োজনের সময় এই ফানেলের কর্কটি খুলে উলফ বোতলে অ্যাসিড মেশাও। অ্যাসিড সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণে মেশার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে উলফ বোতলের নির্গম নল দিয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসবে। গ্যাসটি আগুনের ওপর ধর, দেখবে আগুন নিভে যায়। ছোটখাট আগুন এভাবে নেভানো সম্ভব।

সিদ্ধান্ত ঃ সোডিয়াম কার্বনেট, সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করছে এবং আগুন নেভানোর কাজে আসছে।

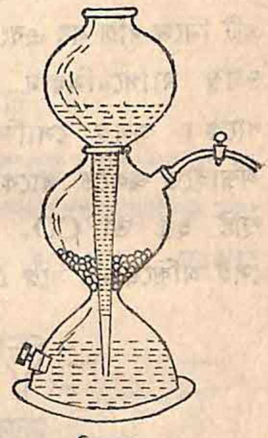
সতর্কতা ঃ বোতলটির মুখ দুটি যেন ছিপি দিয়ে ভাল করে বায়ুরুদ্ধ করা থাকে। বায়ুরুদ্ধ করার জন্য ছিপির মুখে মোম দিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় প্রণালী

প্রয়োজনমত নিয়মিত মোটামুটি পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড পেতে হলে কিপ্‌ যন্ত্রে এটি উৎপন্ন করা যেতে পারে।

কিপ্‌ যন্ত্র হচ্ছে তিনটে গোলকে সংযুক্ত একটি গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র। এটি দুটি অংশে ভাগ করা থাকে। একটি ওপরের অংশ, আর একটি নিচের অংশ। ওপরের অংশে একটি গোলক থাকে, যার

নিচের দিকে দীর্ঘ নল থাকে। দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ নিচের অংশে থাকে একটি পূর্ণ গোলক ও একটি অর্ধ গোলক। এই দুটি অংশ এমনভাবে আটকানো যায় যাতে প্রথমটির দীর্ঘ নল, দ্বিতীয় অংশের পূর্ণ গোলকে ভালভাবে টাইট অবস্থায় থাকে। এবং দীর্ঘনলটি অর্ধগোলকটির প্রায় নিচ পর্যন্ত থাকে। মাঝখানের গোলকের এক পাশে স্টপকর্কযুক্ত একটি নির্গম নল থাকে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই মধ্য গোলকে তৈরি হয় এবং প্রয়োজন মত নির্গম নল দিয়ে বের করে এনে আগুনের ওপর ধরা হয়।



কিপযন্ত্র

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) টেফলনের কিপ্ যন্ত্র (ii) রবারের ছিপি (iii) একটি বাঁকান কাচের নল (iv) চুনাপাথর (v) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

যেভাবে কাজ করবে : মধ্য গোলকে চুনাপাথর রাখ এবং ওপরের গোলকের মধ্যে দিয়ে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল। এই অ্যাসিড নিচের অর্ধগোলক ভর্তি হয়ে যখন মাঝের গোলকে আসবে, তখন চুনাপাথরের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হবে ও গ্যাস উৎপন্ন হবে। স্টপকর্ক খুলে প্রয়োজন মত গ্যাসটি আগুনের ওপর ধর।

প্রয়োজনীয় কথা : সোডিয়াম কার্বনেট ও সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং দ্রবণে থাকে সোডিয়াম সালফেট।

ফটকিরি বা আলুমিনিয়াম সালফেটের সঙ্গে সোডিয়াম বাই কার্বনেটের বিক্রিয়া ঘটিয়েও কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করা সম্ভব। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফেনা সমেত বেরিয়ে আসে।

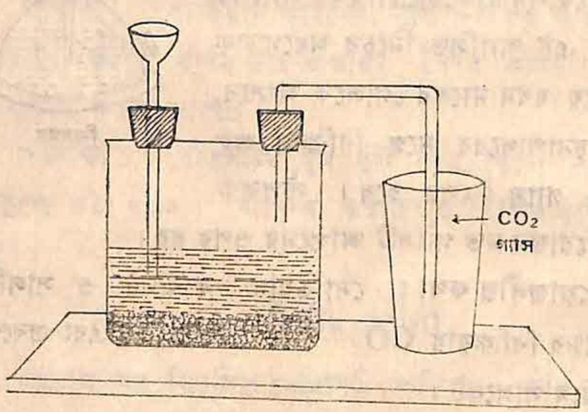
আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত

আগুন নেভাতে CO_2 গ্যাস সক্ষম নয়। কারণ, Mg এর প্রজ্বলনে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই তাপে Mg, কার্বন-ডাই-আক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে MgO এবং কার্বন কণা সৃষ্টি করে। ফলে CO_2, Mg এর আগুন নেভাতে পারে না।

কিপ যন্ত্রে চুনাপাথর ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় CO_2 উৎপন্ন হয়।

[নয়] জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়াম তার কার্বন-ডাই অক্সাইডে জ্বলে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড আগুন নেভাতে সাহায্য করে। কারণ এটি নিজে দাহ্য নয় এবং দহনের সহায়কও নয়। কিন্তু এক টুকরো জলন্ত ম্যাগনেসিয়াম তার কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মধ্যে জ্বলতে থাকে। জ্বলন্ত সোডিয়াম বা পটাসিয়াম ধাতুও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে জ্বলতে থাকে। এর কারণ Mg এর প্রজ্বলনে যে তাপ সৃষ্টি হয় তা CO_2 কে ভেঙ্গে কার্বন ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সেই অক্সিজেনের সঙ্গে Mg বিক্রিয়া করে MgO উৎপন্ন করে।



কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) উলফ বোতল (ii) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) (iii) মার্বেল পাথর (iv) দীর্ঘ নল ফানেল

(v) বাঁকানো কাচের নল (vi) কাচের গ্লাস (vii) ম্যাগনেসিয়াম তার এবং দেশলাই।

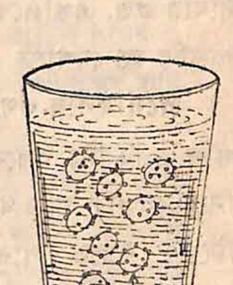
পরীক্ষা ঃ মার্বেল পাথর উলফ বোতলে রেখে, তার মধ্যে দীর্ঘ ফানেলের সাহায্যে লঘু HCl ঢাল। এতে বোতলের অন্য মুখ দিয়ে নির্গম নলের সাহায্যে CO_2 গ্যাস বেরিয়ে কাচের গ্লাসে জমা হবে। এই গ্লাসের মধ্যে জলন্ত Mg তার বা ফিতে ধর। দেখবে আরও উজ্জলভাবে Mg তার জ্বলছে।

সিদ্ধান্ত ঃ CO_2 গ্যাসের মধ্যে Mg তার আরও উজ্জল ভাবে জ্বলে।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ CO_2 এর সঙ্গে Mg বিক্রিয়ায় MgO এবং C উৎপন্ন হয়।

[দশ] ন্যাপথালিন বলের নাচ

এই খেলাটি দেখাবার জন্য একটা বড় কাচের সিলিণ্ডার বা বড় কাচের গ্লাস নিতে হবে। এর মধ্যে প্রথমে অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ ও পরে সোডা ওয়াটার (সোডার জল) ঢেলে দাও। তারপর কয়েকটি ন্যাপথালিন বল ছেড়ে দিলে দেখতে পাবে বলগুলি ওপর-নিচ করছে, অর্থাৎ মনে হবে যেন সেগুলি নাচছে। পরীক্ষাটি ভালভাবে করতে হলে নিচের জিনিসগুলো যোগাড় কর।



গ্লাসের মধ্যে ন্যাপথালিন বলের নাচ

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ (i) একটি বড় কাচের গ্লাস বা সিলিণ্ডার (ii) অক্সালিক অ্যাসিড (iii) ন্যাপথালিন বল (iv) খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই কার্বনেট) (v) জল।

কর কাজ, দেখ মজা ঃ বড় কাচের গ্লাসটি জল দিয়ে প্রায় সবটাই ভর্তি কর। বেশি জল দিলে খেলাটা

দেখতে ভাল লাগবে। জলের মধ্যে বেশি করে অক্সালিক অ্যাসিড গুলে ফেল। প্রতি 100 সিসি জলে 10 গ্রাম মত অক্সালিক অ্যাসিড মেশাও।

এর মধ্যে একটা একটা করে পাঁচ ছ'টা ন্যাপথালিন বল ছেড়ে দাও। এরপর দ্রবণটির মধ্যে খাবার সোডার দ্রবণ মিশিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে ন্যাপথালিন বলগুলি নাচানাচি শুরু করেছে।

কেন এমন হয় ?

অক্সালিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম বাইকার্বনেট বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। খোলা গ্লাসে বা সিলিণ্ডারে গ্যাসটি ওপরে উঠতে থাকে। ন্যাপথালিন বলগুলি সামনে থাকায় সেগুলির গায়ে গ্যাস জমতে শুরু করে এবং পরে সেগুলিকে ঠেলে ওপরে তোলে।

সিলিণ্ডারের ওপরে, গ্যাসের চাপ বেশি থাকায় বলগুলি আবার নিজেদের ভরের জন্য নিচে নেমে আসে। এইরকম বার বার ওঠা নামার জন্য, এগুলিকে নাচছে বলে মনে হয়। জলের মধ্যে লাল, নীল প্রভৃতি রঙ মেশাতে পার তাহলে খেলাটি আরও সুন্দর দেখাবে।

প্রয়োজনীয় কথা : যতক্ষণ CO_2 গ্যাস বেরুবে, ততক্ষণই বলগুলি ওপর নিচ করবে, এরপর আর ওপর নিচ করবে না। গ্লাসের নিচে বলগুলি পড়ে থাকবে। পরীক্ষাটি ইচ্ছে করলে, সোডা ওয়াটার নিয়েও করতে পার। এরজন্য কয়েক বোতল সোডা ওয়াটার একটি বড় সিলিণ্ডারে ঢাল এবং তার মধ্যে কয়েকটি ন্যাপথালিন বল ছেড়ে দাও। একই রকম ফল পাবে। তবে এতে খরচ বেশি ও খেলাটি তুলনামূলকভাবে কম সময় ধরে হবে। রঙীন জল ব্যবহার করলে খেলাটি দেখতে আরো সুন্দর হবে। লাল দ্রবণে খেলাটি দেখাতে চাইলে মিথাইল রেড বা মিথাইল অরেঞ্জ নির্দেশক (Indigcator) ব্যবহার করবে।

যদি স্বাভাবিক উষ্ণতায় (25° সে) খেলাটি দেখতে চাও তবে প্রতি 100 সিসি জলে 10 গ্রাম মত অক্সালিক অ্যাসিড মেশালে চলবে, কিন্তু বেশি উষ্ণতায় খেলাটি দেখতে চাইলে অক্সালিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়াতে হবে। 70° সে উষ্ণতায় অক্সালিক অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় 60 গ্রাম মত করতে হবে।

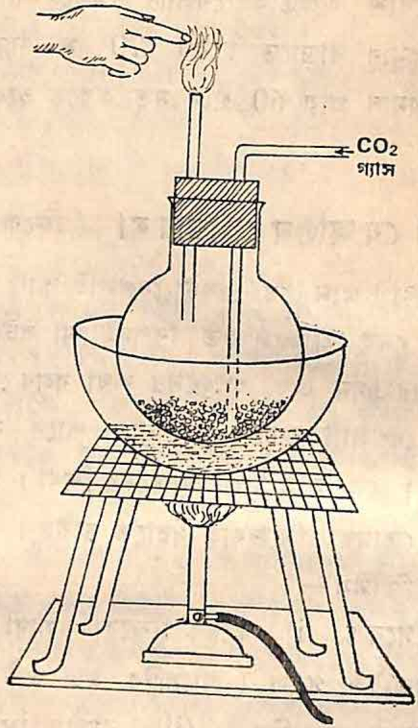
[এগার] যে আগুন পোড়ায় না (ফিকে সবুজ আলো)

তোমরা সবাই জান যে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে যে আগুন জ্বালানো যায়, সেই আগুনে কত বিপদই না ঘটা সম্ভব। কিন্তু এখন তোমাদের এমন এক আগুনের কথা বলব যে আগুন সামান্য একটা খড় বা দেশলাই কাঠিও পোড়াতে পারে না। এ আবার কেমন আগুন? এর নাম ঠাণ্ডা আগুনের শিখা। বুঝতে পারছি, এমন আগুন তোমরা নিজেরাই ধরাতে চাইছ। আর তার জন্য চাই কয়েকটি জিনিস—

যা যা লাগবে : (i) কয়েক টুকরো সাদা ফসফরাস (ii) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (গ্যাসটির জন্য চাই মার্বেল পাথর ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) (iii) বার্নার (iv) গোলতল কূপী (v) কূপী বসাবার জন্য একটা বড় পাত্র (vi) জল।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : গোলতল কূপীটির (ফ্লাস্ক) মধ্যে কিছু শুকনো সাদা ফসফরাসের টুকরো রাখ। এর ওপর কিছু কাচের উল দিয়ে দাও। এবার পাত্রটিকে একটি রাবার কর্ক দিয়ে আটকে দাও। কর্কের ভেতর দুটো মুখ রাখবে। একটি মুখে একটি (4 থেকে 5 ইঞ্চি মাপের) কাচের নল (গ্লাস টিউব) বসাও। অন্য মুখে আর একটি বাঁকান কাচের নল থাকবে, যার ভেতর দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস এই ফ্লাস্কে ঢোকানো হবে। এবার একটি বড় পাত্রে জল নিয়ে ফ্লাস্কটা তার মধ্যে বসিয়ে দাও

ও পাত্রের জল বার্নারের সাহায্যে গরম কর। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে সোজা কাচ নলের মুখে ফিকে সবুজ ধরনের আলো জ্বলে



ঠাণ্ডা আগুনের শিখার সৃষ্টি

উঠছে। অন্ধকার ঘরে পরীক্ষাটি করলে আলোটা সুন্দর দেখা যাবে। এবার এই আলোর আগুনে তোমার যে কোন আঙ্গুল দাও দেখবে কোনরকম গরম অনুভব হচ্ছে না। একটুকরো খড়, এমনকি একটা দেশলাই কাঠি রেখেও দেখতে পার যে খড় বা দেশলাই কাঠিও জ্বলছে না।

সিদ্ধান্ত ঃ সাদা ফসফরাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উপস্থিতিতে গরম করলে ফিকে সবুজ ধরনের আলো দেয়।

সতর্কতা ঃ (i) পরীক্ষায় যে সাদা ফসফরাস ব্যবহার করতে

হবে, তা খুব বিষাক্ত। সুতরাং হাত দিয়ে তা ধরবে না, একটি চিমটে ব্যবহার করবে।

(ii) রাবার কর্কের মধ্যে যে ছুটি কাচের নল ঢোকাবে সেগুলি মোম দিয়ে ভাল করে বায়ুরোধী করে নেবে।

প্রয়োজনীয় কথা : ফ্লাস্কটিকে জলগাহে সামান্য গরম করলে সরু কাচনলের মুখ দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে ফসফরাসের বাষ্প বেরিয়ে আসে। এই বাষ্প বায়ুর সংস্পর্শে এলেই তা ফিকে সবুজ আলোক শিখায় জ্বলে ওঠে।

[বার] জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি কাজের

কোন একটি ভাল ছেলেকে তার পড়ার বিষয় নিয়ে নানাপ্রশ্ন কর, দেখবে সে কেমন চটপট সেগুলির উত্তর দেয়। বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক পরেই যদি তাকে প্রশ্নগুলো করা হয় তবে সে যত ভালো উত্তর করতে পারবে, ঠিক সেভাবে উত্তর করতে সে পারবে না যদি আরও ছ' মাস পরে ঐ প্রশ্নগুলো তাকে করা হয়। অর্থাৎ সদ্য প্রস্তুত করা বিষয়গুলো ভালভাবে উত্তর করা সম্ভব হচ্ছে ছেলেটির আর অনেকদিন বাদে ঐ একই প্রশ্ন সে ভালো করে উত্তর করতে পারে না।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একইভাবে দেখান যায় যে জায়মান হাইড্রোজেন, সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়।

কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে যদি কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন হবার অবস্থাকে গ্যাসটির জায়মান অবস্থা বলে। জায়মান হাইড্রোজেন, সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। কোন কোন বিক্রিয়া যখন সাধারণ হাইড্রোজেন দিয়ে

ঘটান যায় না, তখন জায়মান হাইড্রোজেন দিলে তা সম্ভব হয়। একটি সহজ পরীক্ষা করে এটা দেখান সম্ভব এবং তার জন্য কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন।



জায়মান হাইড্রোজেন পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে মিশছে

প্রয়োজনীয় উপকরণ: (i) টেস্টটিউব (ii) বীকার (iii) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ (iv) দস্তার ছিবড়ে (v) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ: তোমরা কিপযন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা আগেই পেয়েছ। এই যন্ত্রে সুবিধা এই যে প্রয়োজনমত গ্যাসকে ব্যবহার করা যায়। যন্ত্রে দস্তার (জিংক) ছিবড়ে নিয়ে তাতে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে হাইড্রোজেন প্রস্তুত কর। এই হাইড্রোজেন গ্যাস একটি টেস্ট টিউবে রাখা পটাসিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট দ্রবণের মধ্যে পাঠাও। দ্রবণের লাল রঙের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এবার আর একটি টেস্ট টিউবে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ নাও এবং তার মধ্যে কয়েক টুকরো দস্তার

ছিবড়ে এবং সামান্য লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও। দেখবে, পারম্যাঙ্গনেট দ্রবণের লাল রঙ ধীরে ধীরে বর্ণহীন হয়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ সাধারণ হাইড্রোজেন পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটকে বর্ণহীন করতে পারল না, কিন্তু জায়মান হাইড্রোজেন তা বর্ণহীন করে দিল। অর্থাৎ সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে জায়মান হাইড্রোজেন বেশি সক্রিয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, জায়মান হাইড্রোজেনের বিজারণ ক্ষমতা সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ অনেকে বলেন যে উৎপত্তিক্ষণে হাইড্রোজেন পরমাণু অবস্থায় থাকে এবং তাকে H লেখা হয়। সাধারণভাবে হাইড্রোজেন গ্যাসকে H_2 অণু লেখা হয়। পরমাণু অবস্থায় এর সক্রিয়তা বেশি হয়। অনেকে মনে করেন যে সদ্যোজাত অবস্থায় হাইড্রোজেন অধিক চাপে থাকে।

আর একটি পরীক্ষা করেও জায়মান হাইড্রোজেনের বেশি ক্ষমতার পরিচয় পেতে পারো। কমলা রংয়ের পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেটের ($K_2Cr_2O_7$) এর আম্লিক দ্রবণে (H_2SO_4) সাধারণ হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে কোন বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু ঐ দ্রবণে যদি জিংকের ছিবড়ে ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া যায় তবে জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট বিজারিত হয় এবং দ্রবণ সবুজ বর্ণের হয়। এই বিক্রিয়ায় পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট থেকে ক্রোমিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম সালফেট পাওয়া যায়।

[তেরো] জারণ বিজারণের পরীক্ষা

(ক) **লাল থেকে বর্ণহীন ঃ** ব্রোমিন জলকে হাইড্রোজেন সালফাইড দিয়ে বিজারণ ঃ ব্রোমিন জল দেখতে লাল রঙের। এটিকে যদি বিজারণ ঘটান যায়, তবে লাল রঙ আর থাকবে না। হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস এর মধ্যে পাঠালে, ব্রোমিন

বিজারিত হয় এবং বর্ণহীন তরল পাওয়া যায়। নিচের পরীক্ষা করে তোমরা তা দেখতে পার।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) লোহার সালফাইড

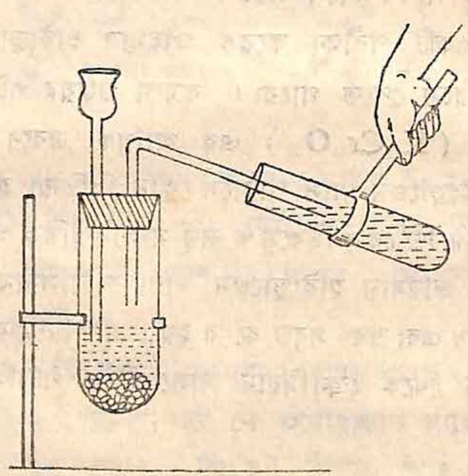
(ii) লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড

(iii) মোটা টেস্টটিউব ও কর্ক

(iv) লম্বা নলাকার কাচের ফানেল ও বাঁকানো কাচ নল।

(v) ব্রোমিন জল

পরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ : একটি মোটা শক্ত টিউবে কিছু লোহার সালফাইড দণ্ড (FeS) নাও এবং একটি ছিপি আটকে দাও। ছিপিতে দুটো মুখ থাকবে। একটি মুখ দিয়ে একটা লম্বা নলাকার কাচের ফানেল ঢোকানো থাকবে, অন্য মুখের ভেতর



ব্রোমিন জলে H_2S গ্যাস পাঠানো হচ্ছে

বাঁকানো কাচের নল থাকবে। বাঁকানো কাচের নলের এক প্রান্ত কর্কের নিচে (ছবির মত) থাকবে এবং অন্য প্রান্ত আরেকটি টেস্ট টিউবে ঢুকবে। এই দ্বিতীয় টেস্টটিউবে ব্রোমিন জল থাকবে। ফানেলের মধ্যে দিয়ে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ধীরে ধীরে ঢাল।

এর ফলে বাঁকানো নল দিয়ে একটা গ্যাস এসে ব্রোমিন জলে ঢুকবে এবং দ্রবণে কালো কালো একটা পদার্থ ভেসে উঠবে এবং লাল ব্রোমিন জল বর্ণহীন হয়ে যাবে। ব্রোমিন জলের টেস্টটিউব সরিয়ে নিলে বাঁকানো নলের মুখ থেকে একটা দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসবে। বীট নুন ঘষলে যেমন গন্ধ হয়, ঠিক তেমন গন্ধ পাবে। অনেকটা পচা ডিমের গন্ধের মতও মনে হয়। এই গ্যাসটির নাম হাইড্রোজেন সালফাইড।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসটি ব্রোমিনকে বিজারিত করে এবং তার ফলে ব্রোমিনের লাল বর্ণ আর থাকে না।

সতর্কতা ঃ লম্বা নলাকার ফানেলটি টেস্ট টিউবের অ্যাসিডে যেন ডোবান থাকে এবং কর্কটা যেন বায়ুরুদ্ধ হয়।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ H_2S গ্যাসটি ব্রোমিনকে বিজারিত করছে এবং সালফার দ্রবণে ভেসে উঠছে। যদিও সালফারের বর্ণ হলুদ, তবু এটি দ্রবণে কালো মত হয়ে ভেসে থাকে। ব্রোমিন বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হয় এবং H_2S জারিত হয়ে সালফারে পরিণত হয়।

(খ) নাইটার দিয়ে লেখা ও আগুনের খেলা ঃ জলে আঁকার তুলি ভিজিয়ে কাগজের ওপর যদি লেখা যায়, তবে সে লেখা কিছুক্ষণের মধ্যেই মুছে যাবে। এখন যদি সেই জলে একটি পদার্থ (নাইটার) গুলে নিয়ে একটি কাগজের ওপর লেখা হয়, এবং তাতে সাবধানে আগুন ধরানো যায় তবে সেই লেখা সহজেই দেখা যাবে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ (i) একটি মোটা সাদা কাগজ

(ii) 10 থেকে 15 গ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেট (এটিকে চলতি কথায় নাইটার বলে।)

(iii) কিছু পরিমাণ জল

(iv) একটা কাচের বাটি ও চামচ

(v) একটি ছবি আঁকার তুলি

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ঃ একটা কাচের বাটি নিয়ে তাতে 10 থেকে 15 গ্রাম মত নাইটার মেশাও ও ভালভাবে চামচ দিয়ে



আগুন ধরাতে নাইটার দিয়ে লেখাগুলো ফুটে উঠছে

নাড়াও। এতে নাইটারের এক দ্রবণ পাওয়া যাবে। এই দ্রবণে একটি তুলি চুবিয়ে নিয়ে তা দিয়ে কাগজের ওপর তোমার নাম লেখ। ইচ্ছে করলে আরও কিছু লিখতে পার। তুলিটা নাইটার দ্রবণে বার বার ভিজিয়ে ঐ লেখাটার ওপর কম করে 4-5 বার বোলাও। এবার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ কর। আর কাগজের একধারে দেশলাই কাঠি দিয়ে আগুন ধরাও। দেখবে, তোমার নাম জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কাগজে নাইটার দিয়ে লিখে যদি আগুনের ছোঁয়া দেওয়া যায় তবে সে লেখা ফুটে ওঠে।

সতর্কতা ঃ আগুন নিয়ে খেলা, সুতরাং সাবধানে কাজটি করবে।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ জ্বলন্ত কাগজটি পটাসিয়াম নাইট্রেটের সংস্পর্শে-জারিত হয়ে যায় এবং লেখাগুলি ফুটে ওঠে।

(গ) রূপোর পুতুল

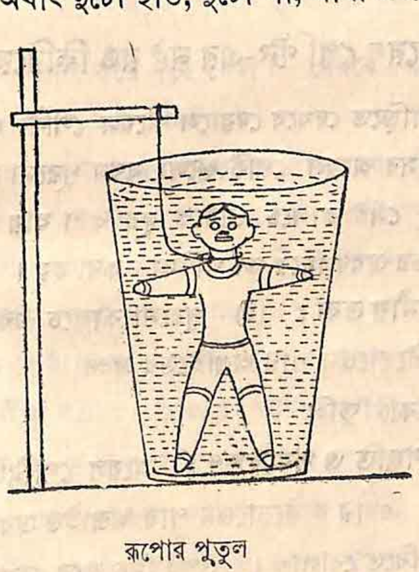
ছোটরা পুতুল ভালবাসে। যদি রূপোর পুতুল তোমার ছোট ভাইবোনকে করে দিতে পার, তবে তারা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। রসায়নের বুদ্ধি খাটিয়ে এই কাজটা তুমি সহজেই করতে পার। এখন যদি কোন তামার পাতকে (কপার সীট) একটা পুতুলের মত করে কেটে তার ওপর রূপোর প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে মনে হবে রূপোর পুতুল। পুতুলটি তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন সেগুলি যোগাড় কর।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) তামার পাত (বড় আকারের)

(ii) কিছু পরিমাণ পরিস্রুত জল (iii) 1 থেকে 2 গ্রাম সিলভার নাইট্রেট,

(iv) একটা বড় কাচের পাত্র। (v) কাচের দণ্ড

কর কাজ, দেখ মজা : একটা বড় তামার পাতকে কেটে পুতুলের আকার কর। অর্থাৎ দুটো হাত, দুটো পা, মাথা ইত্যাদি দেখাও।



রূপোর পুতুল

এবার একটি বড় কাচের পাত্রে পুতুলটাকে ঝুলিয়ে দাও বাইরের কোন রডের সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে।

কাচের পাত্রের মধ্যে $\frac{1}{2}$ লিটার মত জল দাও এবং সিলভার নাইট্রেট লবণটি মেশাও। লবণটি কাচদণ্ড দিয়ে নেড়ে গুলে ফেল। এরপর ছবির মত করে ঐ দ্রবণে তামার পাতের পুতুলটি রেখে দাও। কিছুক্ষণ পর দেখবে তামার পাতের পুতুলটি আর তামার দেখাচ্ছে না, রূপোর দেখাচ্ছে। পুতুলটি কালচে রঙের দেখায়।

সতর্কতা: বিশেষ কিছু সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। তবে সিলভার নাইট্রেট খুব দামী। তাই এটি যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে নজর রাখবে।

প্রয়োজনীয় কথা: সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সিলভার আয়ন তামা দ্বারা বিজারিত হয়ে সিলভারে পরিণত হচ্ছে এবং সেই সিলভার তামার পুতুলের ওপর জমা হচ্ছে। এইভাবে সিলভার বা রূপোর পুতুল তৈরি হচ্ছে। তামা, আবার নিজে জারিত হয়ে কিউপ্রিক নাইট্রেটে [$Cu(NO_3)_2$] পরিণত হচ্ছে।

[চৌদ্দ] অয়েল পেণ্টিং-এর নষ্ট রঙ ফিরিয়ে আনার উপায়

অনেক বাড়িতে দেখবে দেয়ালে অয়েল পেন্টিং (ছবি) টাঙানো আছে। এইসব অয়েল পেন্টিংগুলো যখন পুরনো হয় তখন কালচে হয়ে আসে। সেই কালচে ভাবকে দূর করা যায় যদি হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের দ্রবণ দিয়ে তা পরিষ্কার করা হয়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য: (i) পুরনো কালচে একটি অয়েল পেন্টিং

(ii) হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের দ্রবণ

(iii) একটি তুলি

পরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ: অয়েল পেন্টিংটাকে খাড়া করে দাঁড় করাও। এবার হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দ্রবণ একটি তুলিতে লাগিয়ে তা ছবিতে বোলাও। ওপর নিচ করে বেশ কয়েকবার তুলি বুলিয়ে ঘরের পাখা চালিয়ে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে কালচে

রঙ আলগা হয়ে আসছে। একটা সাদা পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো



ছেলেটি অয়েল পেন্টিংয়ে তুলি বোলাচ্ছে

দিয়ে ছবিটাকে ভাল করে মুছে ফেল। দেখবে অয়েল পেন্টিং এর ছবিটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

সতকর্তা ঃ হাইড্রোজেন পার অক্সাইড যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। দ্রবণটিতে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিণ বা ফসফোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে রাখবে। এতে দ্রবণটি সহজে নষ্ট হয় না। কাচের বোতলের বদলে পলিথিনের বোতলে রাখলে দ্রবণটি ভাল থাকে। দ্রবণটি যথাসম্ভব ঠাণ্ডা স্থানে, সম্ভব হলে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবে।

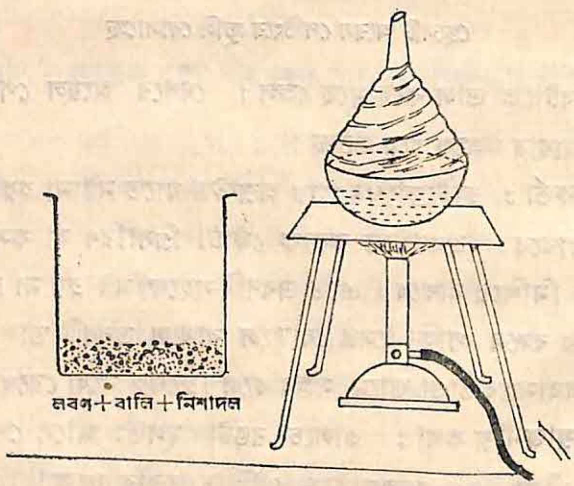
প্রয়োজনীয় কথা ঃ কালচে রঙটা মূলতঃ আসে পেন্ট এর লেড বা সীসা, লেড সালফাইডে পরিণত হবার ফলে। এই লেড সালফাডইকে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে পরিষ্কার করলে লেড সালফাইড ক্রমে ক্রমে সাদা লেড সালফেটে পরিণত হয়। সুতরাং কালচে ভাব চলে যায়।

[পনের] লবণ, বালি ও নিশাদলের মিশ্রণ থেকে প্রতিটি পদার্থ পৃথক করার পদ্ধতি

চাল বা ডালের মধ্যে যদি কাঁকর মিশে থাকে, তবে তা একটা একটা করে বাছতে তোমরা দেখেছ। এখন যদি লবণ ও বালি মিশে যায় তবে তা ঐভাবে আর আলাদা করা যাবে না। এ দুটির সঙ্গে যদি আর একটি পদার্থ যেমন নিশাদল মিশে যায় তবে সেই মিশ্রণ থেকে প্রত্যেকটি উপাদান আলাদা করতে হলে তা কয়েকটি ধাপে করতে হবে। যেভাবে কাজটা করবে তা এবার বলি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ (i) একটি বীকার (ii) জল, (iii) ফানেল (iv) ফিল্টার কাগজ (v) বার্নার। (vi) তার জালি ও স্ট্যাণ্ড।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ঃ একটি পোর্সেলিনের বাটিতে মিশ্রণটি নাও। এর ওপর একটা ফানেল উল্টো করে ঢেকে দাও।



ঊর্দ্ধপাতন প্রক্রিয়া

বাটিটি একটি তারজালির ওপর রেখে নিচে থেকে গরম কর। একটি ফিল্টার কাগজ ভিজিয়ে ফানেলের গায়ে লাগিয়ে রাখ। একটু

লক্ষ্য করলেই দেখবে ফানেলের গায়ে নিশাদল এসে জমা হচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে গরম করে এই পদ্ধতি চালালে সমস্ত নিশাদলটি আলাদা করা যাবে। এই পদ্ধতিটির নাম উর্ধপাতন। এখন লবণ ও বালি বাটিতে পড়ে থাকবে। এই দুটিকে জলের সঙ্গে মেশালে, লবণ দ্রবীভূত হয়ে যাবে এবং বালি নিচে পড়ে থাকবে। ছেঁকে নিলেই বালি আলাদা হয়ে যাবে। এরপর লবণ মেশান জলকে গরম করে জল তাড়িয়ে দিলেই বাটিতে লবণ পড়ে থাকবে।

সিদ্ধান্ত ঃ উর্ধপাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রথমে NH_4Cl-কে আলাদা কর হয়। এরপর নুন ও বালির মিশ্রণে জল দিয়ে ছেঁকে নিলেই বালি আলাদা হয়। সবশেষে নুন জলে তাপ দিয়ে জল তাড়িয়ে নুন পাওয়া যায়। এইভাবে ওপরের তিনটি পদার্থ মিশ্রণ থেকে আলাদা করা সম্ভব।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ লবণ বলতে এখানে NaCl বোঝান হয়েছে। নিশাদলের সংকেত NH_4Cl, এটি উদ্বায়ী পদার্থ। এটিও একরকম লবণ। বালি জলে অদ্রবণীয়, এর সংকেত SiO_2।

[ষোল] ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া

(ক) ফিল্টার কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে

ফিল্টার কাগজ তোমরা অনেকেই দেখেছ। একটি তরলের মধ্যে কোন অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ মিশে থাকলে তা ছেঁকে নেবার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এই কাগজের ওপর যদি কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড ফেলে গরম করা যায়, তবে তা পুড়ে কালো হয়ে যায়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ (i) একটা ফিল্টার কাগজ

(ii) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)

(iii) গরম করার জন্য স্টোভ বা বার্নার

কর কাজ ও রাখ নজর : প্রথমে ফিল্টার কাগজটি নাও। কাগজটির ওপর কয়েক ফোঁটা ঘন H_2SO_4 দাও। এবার সেটি বুনসেন বার্নারের কিছুটা ওপরে (যাতে আগুনের শিখা ফিল্টার কাগজ স্পর্শ না করে) ধর। একটু পরে দেখতে পাবে কাগজটি কালো হয়ে (charring) গেছে।

কেন এমন হয়? সালফিউরিক অ্যাসিড তাপের সাহায্যে কাগজকে পুড়িয়ে কালো কার্বনে পরিণত করে।

সতর্কতা : সালফিউরিক অ্যাসিড যেন বেশি পরিমাণে ফিল্টার কাগজে দেওয়া না হয়। অ্যাসিডটি যেন হাতে-পায়ে না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

প্রয়োজনীয় কথা : কাগজ, সুতো (কটন) প্রভৃতি মূলতঃ সেলুলোজ। এর সহজতম সংকেত হচ্ছে $C_6H_{10}O_5$। ঘন H_2SO_4 সেলুলোজের থেকে জল শোষণ করলে কালো কার্বন পড়ে থাকে এবং বিক্রিয়াটি হয় নিচের মত,—

$$C_6H_{10}O_5 + nH_2SO_4 \rightarrow 6C + [\,5H_2O + nH_2SO_4\,]$$

(খ) চিনি যখন কালো

যদি কোন ছোট ছেলে বা মেয়ের চিনি খাবার খুব বেশি ঝোঁক থাকে, তবে তার সেই স্বভাব দূর করা যায় একটা সুন্দর পরীক্ষার সাহায্যে। ছোটদের কাছে এই পরীক্ষাটি করে দেখাতে হবে যে সাদা চিনি আসলে কালো কাঠ কয়লা। ছোটরা এমনটি দেখলে আর চিনি খাওয়ার বায়না করবে না। তখন তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে বেশি চিনি খেলে পেটে বেশি কাঠ কয়লা জমা হয়, অবশ্য কম পরিমাণ খেলে কোন ক্ষতি হয় না।

পরীক্ষাটির জন্য নিচের জিনিসগুলো যোগাড় কর আর সাবধানে কাজ করে ছোটদের দেখাও।

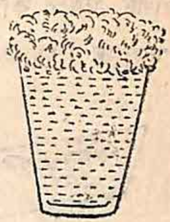
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ (i) 250 সিসি বীকার বা কাচের গ্লাস (সাধারণ সাইজের)

(ii) কিছু চিনি (100 গ্রাম)

(iii) জল

(iv) ঘন H_2SO_4 (50 সিসি)

(v) চামচ বা কাচের রড



কালো ফেনা বেরিয়ে আসছে

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ঃ একটি বীকার বা কাচের গ্লাসের অর্ধেকটা জল দিয়ে ভর্তি কর। এর মধ্যে 100 গ্রাম মত চিনি মেশাও এবং চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়। এরপর ঐ মিশ্রণে ধীরে ধীরে গাঢ় H_2SO_4 মেশাও। যতটা জল ছিল প্রায় ততটা পরিমাণ H_2SO_4 (40 থেকে 50 সিসি মত) মেশাও। দেখবে চিনি ও জলের মিশ্রণ থেকে স্পঞ্জের মত কি যেন বেরিয়ে আসছে। একে কালো ফেনার মতই অনেক সময় মনে হয়। ঘন H_2SO_4 চিনির গঠন কাঠামো ভেঙ্গে কালো কার্বন সৃষ্টি করে।

সিদ্ধান্ত ঃ H_2SO_4, চিনির লেইকে পুড়িয়ে দেয়।

সতকর্তা ঃ ঘন H_2SO_4 এর মধ্যে যেন জল ঢালা না হয়, তাহলে বিস্ফোরণ ঘটবে। জলের মধ্যে অ্যাসিড ঢালা যায়, অ্যাসিডে জল ঢালা ঠিক নয়।

কিছু প্রয়োজনীয় কথা ঃ চিনির সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$ এবং চিনি ঘন H_2SO_4 সংস্পর্শে এলে তার থেকে জল বেরিয়ে কালো কার্বনের সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি আগের পরীক্ষার (ফিল্টার কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে) মতই হয়।

(গ) লটারী থেকে ভাগ্য জানা

এই খেলাটি তোমরা সহজেই দেখাতে পার। এর জন্য একই সাইজের অনেকগুলি কাগজ নিতে হবে। প্রতি কাগজে নানা কথা

লেখা থাকবে। এখন এই কাগজগুলির যে কোন একটি বেছে নিতে বলো তোমার বন্ধুকে আর কাগজটি আগুনের ওপর ধরতে বলো। বন্ধুটি দেখবে কাগজের ওপর তার ভাগ্য লেখা রয়েছে। খেলাটি দেখাতে প্রয়োজন—



কাগজে ভাগ্যলেখা ফুটে উঠছে

উপকরণ ঃ

(1) একই সাইজের অনেকগুলি সাদা কাগজ

(2) একটি গ্লাস রড

(3) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড

(4) মোমবাতি ও দেশলাই

যেভাবে খেলা দেখাবে ঃ গ্লাস রডটি অ্যাসিডে চুবিয়ে নাও এবং প্রতিটি কাগজে, নানান কথা লিখে রাখ। যেমন লিখে রাখো—(i) তোমার দিনগুলো ভালো যাবে, (ii) বড় হয়ে ডাক্তার হবে। (iii) বিদেশ ভ্রমণে যেতে পারবে। (iv) বড় লেখক হবে (v) সমুদ্র যাত্রা নিষেধ ইত্যাদি।

এর পর তুমি তোমার বন্ধুদের একজনকে বলো যে কোন একটি কাগজ তুলে নিতে। সে কাগজ তুলে নিলে, তাকে বলো কাগজটা আগুনের ওপর ধরতে। কাগজটা আগুনে ধরতেই কাগজের ওপর তার ভাগ্যলেখা ফুটে উঠবে।

কেন এমনটি হয় ?

ঘন সালফিরিক অ্যাসিড উত্তাপ পেলে কাগজ থেকে কালো কার্বন বার করে দেয়। তাই অ্যাসিডে লেখা স্থানে আগুন ধরলে কালো লেখা ফুটে ওঠে।

(ঘ) **নীল থেকে সাদা ঃ** তুমি তোমার ছোট ভাই, বোন ও তাদের বন্ধুদের একটা খেলা দেখাতে পার। ম্যাজিকের মতই মনে

হবে। কাজটাও খুব সহজ। খেলাটি হচ্ছে নীল রঙের একটি বস্তুকে তুমি সাদা রঙের বস্তুতে পরিণত করে দেবে। এর জন্য তোমাকে অবশ্য কয়েকটি জিনিস যোগাড় করে নিতে হবে।

উপকরণ:

(i) একটি টেস্ট টিউব

(ii) তুঁতে (নীল রঙ)

(iii) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (50 সিসির মত)

যেভাবে খেলা দেখাবে ও সবাই যা দেখবে:

একটি টেস্ট টিউবে কয়েক টুকরো তুঁতে ভরে নাও। তার মধ্যে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড ফোঁটা ফোঁটা করে মেশাও। দেখবে, নীল তুঁতে ক্রমশঃ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড, নীল তুঁতের গঠনে যে জল থাকে তা শোষণ করে নেয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল তুঁতে তার গঠনের জল হারিয়ে সাদা তুঁতেতে (অনার্দ্র কপার সালফেট) পরিণত হয়।

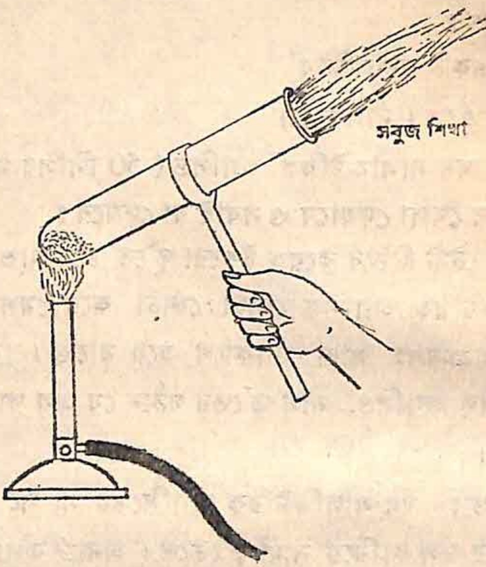
প্রয়োজনীয় কথা ঃ নীল তুঁতের গঠনের জল ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড শুষে নিলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়—

$$\underset{\text{(নীল রঙ)}}{CuSO_4, 5H_2O} \xrightarrow[\text{সালফিউরিক অ্যাসিড}]{\text{ঘন}} \underset{\text{(সাদা)}}{CuSO_4} \text{ (অনার্দ্র)}$$

[সতের] উজ্জ্বল সবুজ আলো

কোন্ আগুন পোড়ায় না'—তা তোমরা আগেই জেনেছ। সেখানে পেলে ফিকে সবুজ আলো। এখন তোমাদের উজ্জ্বল সবুজ আলো দেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারি। আর তার জন্য চাই কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ। পদার্থগুলি যোগাড় করে ফেল, দেখবে

সবুজ আলো কত সহজেই পাওয়া যায়। সবুজ আলো মানেই সবুজ সংকেত, অর্থাৎ দেরী না করেই কাজটা শুরু করে দাও।



সবুজ শিখার সৃষ্টি

উপকরণ :—(i) 2 থেকে 3 গ্রাম সোডিয়াম বা পটাসিয়াম বোরেট (ii) অ্যালকোহল (মিথাইল বা ইথাইল অ্যালকোহল (iii) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (10 সিসি) (iv) বার্নার (v) একটা টেস্ট টিউব।

যে ভাবে করবে কাজ, আর দেখবে আলো : একটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমাণ সোডিয়াম বোরেট নাও। এর মধ্যে 5 সিসি অ্যালকোহল দাও। এতে কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও। টেস্ট টিউবটাকে এবার বার্নারে গরম কর। গরম করার ফলে টেস্ট টিউবের মুখ দিয়ে যে বাষ্প বেরোবে—তা বার্নারে ধর। দেখবে, সবুজ আলোর শিখা ছড়িয়ে পড়েছে।

সিদ্ধান্ত : বোরেট লবণ, অ্যাসিডের উপস্থিতিতে গরম করলে

মিথাইল বোরেটের (বা ইথাইল বোরেট) বাষ্প ও অ্যালকোহল বাষ্প বেরিয়ে এসে টেস্ট টিউবের মুখে সবুজ শিখার সৃষ্টি করে।

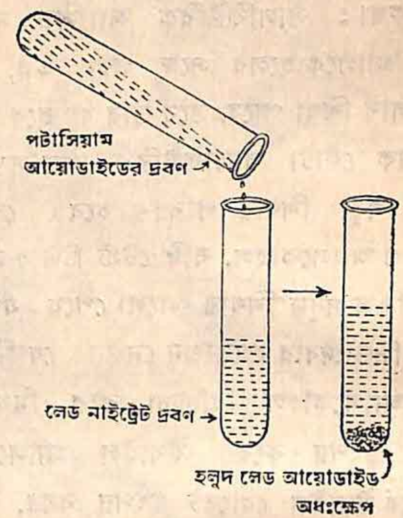
আরও কিছু কথা : সালফিউরিক অ্যাসিড না দিয়ে যদি বোরেট লবণটি অ্যালকোহলের সঙ্গে গরম কর, তখনও টেস্ট টিউবের মুখে আলোর শিখা পাবে, তবে তার বর্ণ হবে উজ্জ্বল হলুদ। কিন্তু দ্রবণে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড দিলেই সেই হলুদ রঙের শিখা সবুজ শিখায় পরিণত হবে। বোরেটের বদলে বোরিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহল, যদি টেস্ট টিউবে নাও ও বার্নারে গরম কর, তবেও কিন্তু সবুজ শিখার আলো পেয়ে যাবে। এরজন্য সালফিউরিক অ্যাসিড দেবার প্রয়োজন নেই। বোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল বিক্রিয়া করে মিথাইল বোরেট [$B(OH_3)_3$] উৎপন্ন করে। ইথাইল অ্যালকোহল একই রকম বিক্রিয়া করে ইথাইল বোরেট উৎপন্ন করে, কিন্তু ইথাইল বোরেটের চেয়ে মিথাইল বোরেট বেশি উদ্বায়ী, সেজন্য ইথাইল অ্যালকোহলের চেয়ে মিথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করা শ্রেয়।

[আঠার] জলের মধ্যে চিকমিকে সোনার গুঁড়ো

তোমরা সোনা দেখেছ। কোন সোনার জিনিসকে খুব ছোট ছোট করে কেটে জলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে, মনে হয় জলের মধ্যে যেন সোনালী রঙ চিকমিক করছে। সোনা ছাড়াই জলের মধ্যে তুমি এরকম খেলা দেখাতে পার এবং তার জন্য চাই কয়েকটি জিনিস।

যা যা লাগবে—(i) লেড নাইট্রেট দ্রবণ (ii) পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ (iii) বার্নার (iv) কয়েকটি টেস্টটিউব।

যেভাবে করবে কাজ ও রাখবে নজর : একটি টেস্ট টিউবে লেড নাইট্রেটের দ্রবণ (5 সিসি) নাও এবং এর মধ্যে ধীরে ধীরে



চিকমিকে সোনার সৃষ্টি

অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ মেশাও। মিশ্রণটি ভাল করে ঝাঁকাও। দেখবে, হলুদ রঙের একটা অধঃক্ষেপ টেস্ট টিউবের নিচে জমা পড়েছে। টেস্ট টিউবটি গরম কর, দেখবে হলুদ অধঃক্ষেপ গুলে যাচ্ছে, আর দ্রবণটি বর্ণহীন হয়ে গেছে। এবার টেস্ট টিউবটি ঠাণ্ডা করো (একটা বীকারে জল নিয়ে তার মধ্যে টেস্ট টিউবটি বসিয়ে দিলেই টেস্ট টিউবটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবে)। ঠাণ্ডা হয়ে এলেই দেখতে পাবে, টেস্ট টিউবের দ্রবণটি সোনার দানার মত চকচক করছে। এই চকচক করার জন্য দায়ী যে পদার্থটি তা হচ্ছে লেড আয়োডাইড।

প্রয়োজনীয় কথা : লেড নাইট্রেট ও পটাসিয়াম আয়োডাইড এর দ্রবণ যদি না যোগাড় করতে পার, তবে ঐ পদার্থ দুটি দোকান থেকে কিনে জলে গুলে নেবে। একটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমাণ (1-2 গ্রাম মত) লেড নাইট্রেট নিয়ে 10 সিসি. জলে গুলে

ফেল। ঠিক একই ভাবে আর একটি টেস্ট টিউবে 1 থেকে 2 গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডাইড কিছুটা জলে গুলে ফেল। এই দুটি দ্রবণ পরস্পর যখন মেশাবে, তখন যে বিক্রিয়া ঘটে, তার ফলে লেড আয়োডাইড উৎপন্ন হয়।

[উনিশ] অ্যাসিড ও ক্ষারের যুদ্ধ

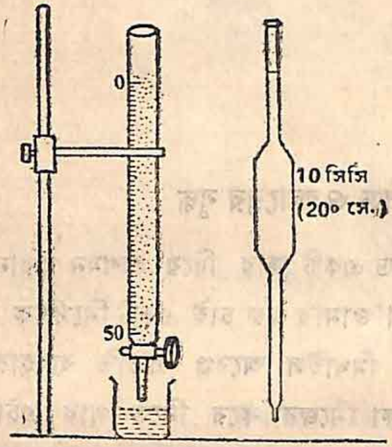
সাধারণভাবে একটি অ্যাসিড একটি ক্ষার দিয়ে প্রশমন করান যায়। প্রশমিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য চাই একটি নির্দেশক। নির্দশক হিসেবে ফেনপথ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। একটা সহজ পরীক্ষা নিজেরা করে নিতে পার এটা বোঝার জন্য। এর জন্য একটা কাচের গ্লাসে কিছুটা কাপড় কাচার সোডা নিয়ে নাও। সোডার মধ্যে কিছু জল ঢেলে তা একটা কাঠি দিয়ে নেড়ে গুলে ফেল। তাতে 3 থেকে 4 ফোঁটা মিথাইল অরেঞ্জ মেশাও এবং তার মধ্যে প্রথমে অল্প অল্প করে এবং পরে ফোঁটা ফোঁটা করে লঘু H_2SO_4 মেশাও। দেখবে মিথাইল অরেঞ্জের রঙ বদলে যাচ্ছে এবং লাল বর্ণ ধারণ করছে। যে বিন্দুতে এই পরিবর্তন ঘটছে সেই বিন্দুটিকে বলে প্রশমন বিন্দু। এইভাবে প্রশমনের পরীক্ষা করা হয়।

এখন নিখুঁতভাবে প্রশমন পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হলে নিচের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যোগাড় কর এবং পরীক্ষা পদ্ধতি মেনে কাজ কর। দেখবে প্রশমন বিন্দু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রশমন বিন্দুতে অ্যাসিড বা ক্ষার কারও ধর্ম থাকে না। অর্থাৎ এই বিন্দুতে অ্যাসিড ও ক্ষারের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশমন পরীক্ষা

(অ্যাসিড এবং ক্ষারের বিক্রিয়া)

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) অ্যাসিড (এক নির্দিষ্ট মাত্রার HCl 100 সিসি.)



অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়া

(ii) ক্ষার (NaOH এর দ্রবণ 100 সিসি)

(iii) ব্যুরেট

(iv) পিপেট (10 সিসি মাপ করার উপযুক্ত)

(v) বীকার

(v) পরিস্রুত জল

(vi) নি র্দে শ ক (ফেনপথ্যালিন)

(vii) আলোড়ক

(viii) ব্যুরেট আটকাবার স্ট্যাণ্ড ও ক্লাম্প

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ :

ব্যুরেট ও পিপেটটি প্রথমে পরিস্রুত জল দিয়ে ধুয়ে নাও। এরপর অল্প ক্ষার দিয়ে পিপেটটি বার দুয়েক ধুয়ে নাও। ব্যুরেটটিও অল্প অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে নাও। এরপর ব্যুরেটে অ্যাসিড ভর। একটি বীকারে পিপেটের সাহায্যে 10 সিসি ক্ষার নাও এবং তাতে একফোঁটা ফেনপথ্যালিন (নির্দেশক) মেশাও। দেখবে ক্ষার দ্রবণটি ফিকে লাল রঙের হয়ে গেছে। এবার ব্যুরেট থেকে ধীরে ধীরে অ্যাসিড বীকারে ঢাল। যখন দেখবে লাল রঙ ফিকে হয়ে আসছে, তখন অ্যাসিড ফোঁটা ফোঁটা করে দেবে। এতে দেখবে হঠাৎ লাল রঙটা চলে যাবে এবং সেই সময় ব্যুরেটের

দিকে লক্ষ্য কর এবং দেখ কতখানি অ্যাসিড খরচ হয়েছে। এই-ভাবে 10 সিসি ক্ষার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যাসিড দ্বারা প্রশমিত হয়। অ্যাসিডের আয়তন নির্ভর করে অ্যাসিডের শক্তির ওপর।

সর্তকতা ঃ (i) ব্যুরেটের মধ্যে অ্যাসিড যেন ঠিক শূন্য দাগে থাকে।

(ii) ব্যুরেট যেন অ্যাসিড দিয়ে এবং পিপেট যেন পরীক্ষণীয় ক্ষার দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়।

(iii) ফেনপথ্যালিন যেন না বেশি ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষায় এক ফোঁটাই যথেষ্ট।

(iv) বীকার যেন ক্ষার বা অ্যাসিড দিয়ে ধোওয়া না হয়। এটিকে সব সময় পরিস্রুত জল দিয়ে ধোবে।

(v) কতটা অ্যাসিড লাগল তা জানার জন্য ব্যুরেটের অ্যাসিডের নিচের বক্রতার দিকে তাকাবে। ক্ষার নেবার সময়ও পিপেটের নিচের বক্রতার দিকে তাকাবে।

(vii) নিখুঁত পরীক্ষার ফল পেতে হলে, একই পরীক্ষা অন্ততঃ তিনবার করবে।

রাখলে মনে লাগবে কাজে ঃ এই পরীক্ষায় NaOH কে HCl দিয়ে প্রশমিত করার কথা বলা হয়েছে। ধর 1·1 (N/10) HCl দ্রবণ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ধর এই দ্রবণের 9·5 সিসি লেগেছে ক্ষারের প্রশমনের জন্য। ক্ষারের দ্রবণ নেওয়া হয়েছে 10 সিসি। এখন ক্ষারের গাঢ়ত্ব জানা যাবে একটি সমীকরণ থেকে। সমীকরণটি হল $V_1 \times S = V_2 \times S_2$. যেখানে V_1 = ক্ষারের আয়তন (সিসি) S_1 = ক্ষারের গাঢ়ত্ব, V_2 = অ্যাসিডের আয়তন এবং S_2 = অ্যাসিডের গাঢ়ত্ব। এখানে $V_1 = 10$ সিসি, S_1 = অজানা এবং $V_2 = 9{\cdot}5$ সিসি এবং $S_2 = 1{\cdot}1$ (N/10)। সুতরাং সমীকরণ থেকে ক্ষারের গাঢ়ত্ব জানা যাবে।

[কুড়ি] বিভিন্ন বিক্রিয়া বিভিন্ন গতিতে ছোটে

যদি কোন দশ-বারো বছরের মজুরকে 1000 ইট একতলা থেকে তিনতলায় তুলে আনতে বল, তবে সে সেই কাজটি করতে অনেক সময় নেবে। কাজ করাতে গিয়ে দেখলে যে ছেলেটি (মজুরটি) প্রতিবারে দুটি করে ইট হাতে করে নিয়ে ওপরে উঠছে। এ কাজ করতে ছেলেটির বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। এখন যদি শক্ত সমর্থ (20-25 বছরের) কোন মজুরকে ঐ একই কাজ করতে বল, তবে দেখবে সে প্রতিবার আটটা করে ইট মাথায় করে নিয়ে ওপরে উঠছে। এইভাবে সে 125 বার ওপরে উঠে কাজটি করে দিল। অথচ কম বছরের মজুরটিকে ঐ একই কাজ করতে 500 বার ওপরে উঠতে হয়েছে। সুতরাং শক্তিমান মজুরটি অনেক তাড়াতাড়ি কাজটি সারতে পারে।

বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও অনেক সময় এমনটি দেখা যায়। অর্থাৎ বেশি গাঢ়ত্বের একটি রাসায়নিক পদার্থ কম গাঢ়ত্বের ঐ একই পদার্থের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বিক্রিয়া ঘটায়। বিক্রিয়ক পদার্থগুলি কি অবস্থায় আছে তার ওপরও বিক্রিয়ার হার নির্ভর করে। নিচের পরীক্ষাটা করলেই বিক্রিয়ার হারের পার্থক্য বোঝা যাবে। এর জন্য কয়েকটি জিনিসের প্রয়োজন।

(ক) প্রয়োজনীয় দ্রব্য—(i) কিছুটা গুঁড়ো চক (ii) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (iii) জল, (iv) মার্বেল পাথর (v) টেস্ট টিউব।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : একটি টেস্ট টিউবে কিছুটা জল নিয়ে তার মধ্যে চকের গুঁড়ো ঢেলে দাও। এবার টেস্ট টিউবটি ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে তাতে 2 সিসি মত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশাও। বিক্রিয়ার প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেখ। বিক্রিয়া কত তাড়াতাড়ি হচ্ছে তা সহজেই বুঝতে পারবে। এরপর আর একটি

টেস্ট টিউবে ছোট ছোট মার্বেল পাথরের টুকরো নাও। ও তাতে ঐ একই পরিমাণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল। লক্ষ্য করে দেখ যে বিক্রিয়াটি আগের মত অত তাড়াতাড়ি ঘটছে না।

সিদ্ধান্ত : একই বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন হারে বিক্রিয়া করে।

আরো কিছু কথা : গুঁড়ো অবস্থায় অ্যাসিড ভাল করে চকের সঙ্গে মিশতে পারছে। অর্থাৎ চকের গুঁড়ো অবস্থায় বেশি Surface area-কে স্পর্শ করছে অ্যাসিড, তাই বিক্রিয়া দ্রুত ঘটছে। আর মার্বেল পাথরের ক্ষেত্রে কম পরিমাণ Surface area-তে অ্যাসিডের স্পর্শ ঘটছে। তাই বিক্রিয়ার গতি কমে গেছে।

(খ) মজুরের উদাহরণের সঙ্গে মিল রেখে আর একটা রাসায়নিক পরীক্ষা তোমরা করতে পার এবং সেজন্য প্রয়োজন

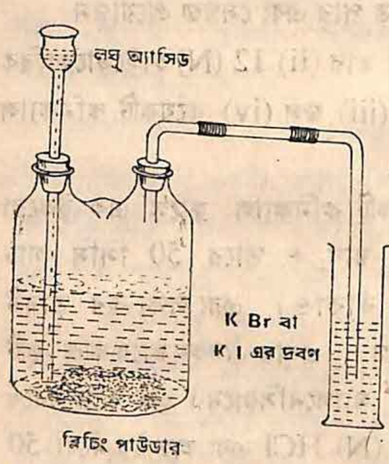
(i) কয়েকটি ম্যাগনেসিয়াম তার (ii) 12 (N) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (অর্থাৎ ঘন অ্যাসিড) (iii) জল (iv) কয়েকটি কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা কাচের গ্লাস।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : একটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে এক টুকরো (4 সেমি) ম্যাগনেসিয়াম তার রাখ ও তারে 50 সিসি গাঢ় [12(N)] HCl মেশাও এবং ঝাঁকাও। এবং লক্ষ্য কর তারটি অ্যাসিডে গুলতে কত সময় লাগে। এবার ঐরকমভাবে অন্য দুটি কনিক্যাল ফ্লাস্কে ঐ 4 সেমি লম্বা ম্যাগনেসিয়ামের দুটি তার রেখে দাও ও একটির মধ্যে 50 সিসি 6 (N) HCl এবং অন্যটির মধ্যে 50 সিসি 3 (N) HCl মিশিয়ে ঝাঁকাও এবং দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখ তার গুলে যেতে কত সময় লাগছে। সময়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, অ্যাসিডের মাত্রা যত কমছে অর্থাৎ অ্যাসিড যত লঘু হচ্ছে, ম্যাগনেসিয়ামের তার গুলে যেতে তত বেশি সময় লাগছে। অর্থাৎ Mg এবং HCl এর বিক্রিয়ার হার নির্ভর করছে HCl এর গাঢ়ত্বের ওপর। বিক্রিয়ার হার তুলনা করার সময় Mg এর পরিমাণ প্রতি ক্ষেত্রে একই রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ গাঢ় অ্যাসিড তাড়াতাড়ি এবং লঘু অ্যাসিড অপেক্ষাকৃত দেরিতে বিক্রিয়া ঘটায়।

[একুশ] ব্রোমিন ও আয়োডিনের চেয়ে ক্লোরিন বেশি সক্রিয়

ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন এই তিনটি মৌল একই পরিবারভুক্ত। এদের সক্রিয়তা বিভিন্ন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের চেয়ে বেশি সক্রিয়। নিচের জিনিসপত্র যোগাড় করে তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার, ওপরের কথাটা ঠিক কিনা।



উৎপন্ন ক্লোরিন KBr এবং KI দ্রবণে পাঠান হচ্ছে

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ

(i) ব্লিচিং পাউডার

(ii) লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড

(iii) পটাসিয়াম ব্রোমাইডের দ্রবণ (KBr)

(iv) পটাসিয়াম আয়োডাইডের দ্রবণ (KI)

(v) ব্রোমিন জল

কাজ কর, দেখ মজা ঃ দুটি পরীক্ষা নলের একটিতে পটাসিয়াম ব্রোমাইড এবং অপরটিতে পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ নাও। এরপর একটি উলফ্ বোতলে ক্লোরিন উৎপন্ন করে গ্যাসটি একবার KBr দ্রবণে এবং আরেকবার KI দ্রবণে পাঠাও। এই ক্লোরিন গ্যাসটি তৈরি করতে পার ব্লিচিং পাউডার ও লঘু HCl দিয়ে। বোতলে কিছুটা ব্লিচিং পাউডার নাও এবং ওপর থেকে

ফানেলের মধ্যে দিয়ে লঘু অ্যাসিড ঢাল। বাঁকা নির্গম নল দিয়ে যে ক্লোরিন গ্যাস বেরোবে তা আলাদা আলাদাভাবে প্রথমে KBr ও পরে KI দ্রবণে পাঠাও। দেখবে, KBr দ্রবণ থেকে ব্রোমিন বেরিয়ে দ্রবণটিকে বাদামী করে দিয়েছে। KI দ্রবণে ঐ ক্লোরিন গ্যাস পাঠালে দেখবে আয়োডিন বেরিয়ে দ্রবণটিকে (Violet) বেগুনী বর্ণের করে দিয়েছে। এবার আর একটি টেস্ট টিউবে পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ নাও এবং তাতে দু' তিন ফোঁটা ব্রোমিন দ্রবণ মেশাও। দেখবে, বেগুনী রঙের দ্রবণ সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ আয়োডিন বেরিয়ে এসেছে KI দ্রবণ থেকে।

সিদ্ধান্ত : Cl_2, KBr এবং KI থেকে যথাক্রমে Br_2 এবং I_2 বার করে দেয়।

প্রয়োজনীয় কথা : ব্লিচিং পাউডার থেকে HCl, Cl_2 বার করে এইভাবে ; $CaOCl_2+2HCl=CaCl_2+H_2O+Cl_2$.

পটাসিয়াম ব্রোমাইড ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ থেকে ক্লোরিন, যথাক্রমে ব্রোমিন ও আয়োডিন মুক্ত করে। বিক্রিয়া দুটিকে লেখা যায় নিচের সমীকরণ দিয়ে।

$$2KBr+Cl_2=2KCl+Br_2$$

$$2KI+Cl_2=2KCl+I_2$$

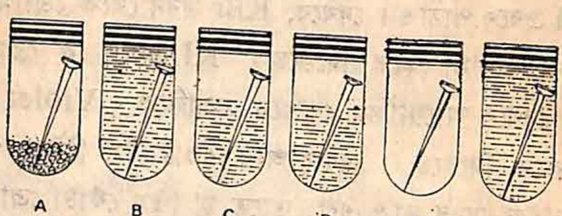
এছাড়া, KI দ্রবণে, ব্রোমিন জল দিয়ে যে আয়োডিন বেরোয়, সেটিকে সমীকরণ দিয়ে লেখা যায় এইভাবে—

$2KI+Br_2=2KBr+I_2$ (বেগুনী)

[বাইশ] লোহায় কিভাবে মরচে ধরে ?

লোহায় মরচে ধরতে তোমরা দেখ। কিন্তু কিভাবে এই মরচে ধরে তা কি তোমরা জান? এই মরচে ধরার জন্য দুটি বস্তুর হাত থাকে। একটি হচ্ছে জল, অপরটি বায়ুর অক্সিজেন। একটির অভাব ঘটলেই মরচে ধরে না। বিভিন্ন অবস্থায় লোহাকে রেখে

সহজে মরচে ধরার পরীক্ষা করা যেতে পারে। এর জন্য দরকার কয়েকটি জিনিস।



লোহায় মরচে ধরার পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) কয়েকটি লোহার পেরেক (ii) কয়েকটি রাবার কর্কযুক্ত টেস্ট টিউব (iii) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (iv) ফোটানো জল (v) সাধারণ জল (vi) সমুদ্রের জল (vii) কেরোসিন তেল।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : ছয়টি টেস্ট টিউব নাও এবং প্রতেকটিকে বিভিন্ন অবস্থায় রাখো। প্রথমটিতে (A-তে) কিছু পরিমাণ অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, দ্বিতীয়টিতে (B-তে) ফোটানো জল, তৃতীয়টিতে (C-তে) সমুদ্রের জল, চতুর্থটিতে (D-তে) সাধারণ জল, পঞ্চমটি (E) খালি অবস্থায় এবং শেষেরটিতে (F-তে) কেরোসিন তেল রাখো। এরপর প্রতিটি টেস্টটিউবে একটি করে উজ্জ্বল পরিষ্কার পেরেক রাখো। পেরেকগুলি ইচ্ছে করলে প্রথমে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পরে পরিস্রুত জলে ধুয়ে নিতে পারো। দ্বিতীয় টেস্ট টিউবটি ফোটানো জল এবং ষষ্ঠ টিউবটি কেরোসিন তেল দিয়ে পুরোপুরি ভরে নাও। তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্ট টিউব দুটোর অর্ধেক যথাক্রমে সমুদ্রের জল ও সাধারণ জল দিয়ে ভরে নাও।

তিন চার দিন অপেক্ষা করার পর লক্ষ্য করো যে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ টেস্ট টিউবের পেরেক তিনটিতে মরচে ধরে নি। তবে দীর্ঘদিন রেখে দিলে পঞ্চম টেস্ট টিউবের পেরেকে মরচে ধরত, কারণ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে পেরেকটির সঙ্গে বিক্রিয়া করে মরচে ধরাত।

অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যেটির মধ্যে আছে সেখানের টেস্ট টিউবে মরচে কম ধরেছে। অর্থাৎ বায়ুর CO_2, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে শোষিত হয়েছে, তাই মরচে কম ধরেছে। CO_2 এর উপস্থিতি মরচে ধরায় সাহায্য করে। সাধারণ জল যে টেস্ট টিউবে আছে সেখানে মোটামুটি মরচে ধরেছে। সমুদ্রের জল যেটির মধ্যে আছে, সেখানে মরচে ধরেছে সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ ধাতব লবণের উপস্থিতিতে মরচে ধরার পরিমাণ বেড়ে যায়। সমুদ্রের জলে ধাতব লবণ থাকে. এই কারণে ঐ টেস্ট টিউবে মরচে ধরেছে বেশি পরিমাণে। ষষ্ঠ টেস্ট টিউবে তেল আছে, সেখানে কোন মরচে ধরে নি। কারণ তেলের মধ্যে পেরেকটির বায়ু বা জল কোনটারই সংযোগ ঘটে নি।

সিদ্ধান্ত : বায়ু ও জল (বা জলীয় বাষ্পের) উপস্থিতিতে মরচে ধরে।

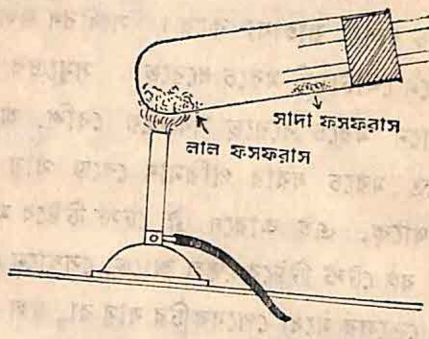
সতর্কতা : মরচে ধরা পেরেক সাবধানে সরিয়ে রাখবে, যেখানে সেখানে ফেললে, তা বিপদ ঘটাতে পারে।

প্রয়োজনীয় কথা : বায়ু ও জলের উপস্থিতিতে লোহায় যে মরচে ধরে তার সংকেত মোটামুটিভাবে বলা হয় $Fe_2O_3, x H_2O$, যেখানে x হচ্ছে পরিবর্তনশীল একটি সংখ্যা। x এর মান নির্ভর করে জলের প্রাচুর্যের ওপর এবং মরচে কেমন ধরেছে তার ওপর।

[তেইশ] লাল ফসফরাস থেকে সাদা ফসফরাস উৎপাদন

ফসফরাস একটি মৌল। এটি দুটি রূপভেদে প্রধানতঃ থাকে— একটি লাল ফসফরাস, অপরটি সাদা ফসফরাস। লাল ফসফরাসের কোন বিষক্রিয়া নেই, কিন্তু সাদা ফসফরাসের তীব্র বিষক্রিয়া আছে। লাল ফসফসরাসকে 550°c এর বেশি উষ্ণতায়, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবেশে গরম করলে সাদা ফসফরাস পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) একটি শক্ত মোটা টেস্ট টিউব ও রাবারের ছিপি



লাল ফসফরাস থেকে সাদা ফসফরাস

(ii) দুটি কাচনল
(iii) লাল ফসফরাস
(iv) মার্বেল পাথর ও-লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
(v) বার্নার

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : একটি শক্ত মোটা টেস্ট টিউবে কিছু পরিমাণ লাল ফসফরাস নাও। এরপর একটা রবারের ছিপি দিয়ে টেস্ট টিউবটি আটকে দাও। ছিপির মধ্যে ফুটো করে দুটি কাচনল ঢোকাও। একটির মধ্যে দিয়ে শুকনো কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাঠাবার ব্যবস্থা কর। মার্বেল পাথরের মধ্যে লঘু HCl ঢেলে কার্বন-ডাই অক্সাইড প্রস্তুত করে তা ঐ-শক্ত মোটা টেস্ট টিউবে পাঠাও। এবার লাল ফসফরাসের নিচে বার্নার রেখে গরম কর। যখন উষ্ণতা 550°c ছাড়িয়ে যাবে, তখন লাল ফসফরাস বাষ্প আকারে উঠে যাবে এবং টেস্ট টিউবের ওপরের দিকে ঠাণ্ডা জায়গায় আবার জমে যাবে। তবে তখন রূপভেদ হয়ে যাবে অর্থাৎ লাল থেকে সাদা ফসফরাস পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত : CO_2 এর উপস্থিতিতে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতার উপরে এলেই লাল ফসফরাস বাষ্প হয়ে উঠে যায়, পরে ঠাণ্ডা হলে তা সাদা ফসফরাসে পরিণত হয়।

[চব্বিশ] আগুন দিয়ে লেখা

আগুন নিয়ে খেলা করা উচিত নয় তোমরা সবাই জান। তাই আগুন দিয়ে লেখা কি উচিত হবে ? হয়ত উচিত নয়, কিন্তু মজা পেতে হলে, দু' একবার সেরকম একটা জিনিস দেখার ইচ্ছে অনেকেরই জাগে। এ খেলায় আগুন এসে গেলেও, সাবধানে কাজ করলে ভয় বিশেষ নেই। খেলাটি দেখাতে অর্থাৎ আগুনের লেখা ফোটাতে তোমাদের চাই—

উপকরণ :

(i) কয়েক টুকরো সাদা ফসফরাস (ii) কার্বন ডাই সালফাইড (50 সিসি) (iii) একটি বীকার (iv) একটি তুলি (v) বড় সাদা কাগজ।

কর কাজ, দেখ মজা : প্রথমে একটি বীকারে কার্বন-ডাই সালফাইড তরলটি নাও। এর মধ্যে কয়েক টুকরো সাদা ফসফরাস দাও এবং একটি কাচদণ্ড দিয়ে নেড়ে দাও। দেখবে ফসফরাস কার্বন ডাই-সালফাইডে গুলে গেছে। এবার একটি তুলি এনে (একটি কাঠির মাথায় তুলো বেঁধে) এই দ্রবণে চোবাও এবং তারপর তুলি দিয়ে একটা বড় সাদা কাগজে কিছু কথা লিখে দাও। ইচ্ছে করলে লিখতে পার—'আসছে আগুন, সাবধান'।

ওপরের কথাটি—লিখতে না লিখতেই দেখতে পাবে লেখার ওপর আগুন ধরে গেছে ও তোমার লেখাটা আগুন দিয়েই লেখা হয়ে গেছে।

কেন এমন হয় : কার্বন-ডাই সালফাইডে ফসফরাস গুলে যায়।

এই দ্রবণ দিয়ে লেখার পর কার্বন-ডাই সালফাইড উবে যায়। সাদা ফসফরাস তখন বায়ুর স্পর্শে আসে ও জ্বলে ওঠে।

আরও কিছু কথা : কার্বন-ডাই সালফাইড একটি দ্রাবক। এটি ফসফরাসকে সহজেই গুলে ফেলে।

[পঁচিশ] তড়িৎ লেপন

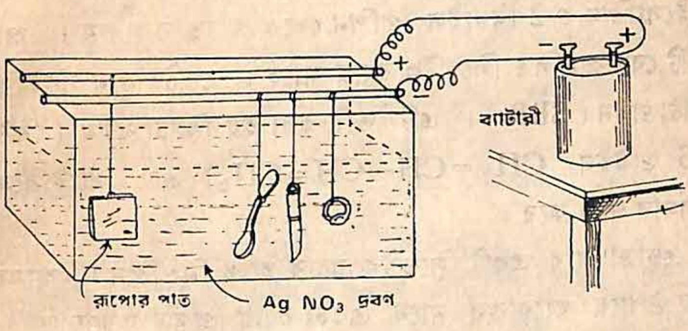
একটি ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ

বিভিন্ন ধাতু বা অ্যালয়কে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। পেতল, লোহা প্রভৃতির তৈরি জিনিসের ওপর নিকেল. জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, রূপো বা সোনার পাতলা প্রলেপ দিতে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। একে তড়িৎ লেপন বলে। লোহায় মরচে ধরা বন্ধ করার জন্য জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে গ্যালভানাইজড লোহা বলে। যদি একটি লোহার চামচ বা ছুড়িকে রূপোর আস্তরণ দিতে চাও, তবে নিচের জিনিসগুলো যোগাড় কর এবং পরীক্ষাটি সাবধানে কর।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) বড় আকারের রূপোর পাত (ii) সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (iii) লোহার ছুড়ি, চামচ (iv) ব্যাটারি (v) বড় কাচের পাত্র (vi) পরিস্রুত জল (vii) লঘু NaOH দ্রবণ (viii) লঘু HCl.

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : ছুড়ি, চামচ এগুলিকে ভাল করে প্রথমে ঘষে নাও। তারপর লঘু কস্টিক সোডা দ্রবণে তা ধুয়ে ফেল। এতে তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকলে তা দূর হয়ে যাবে। এরপর লঘু HCl এ-তা ধুয়ে নাও। এতে অক্সাইড জাতীয় কিছু গঠন হয়ে থাকলে তা দূর হবে। এরপর পরিস্রুত জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেল। এরপর এগুলি তড়িৎ বিশ্লেষক কোষের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। ব্যাটারির ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে এগুলিকে

যোগ কর যাতে এগুলি ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এবার রূপোর পাত একটি ধাতব দণ্ডের সাহায্যে পাত্রের মধ্যে ঝুলিয়ে



তড়িৎ লেপন পরীক্ষা

দাও। রূপোর পাতটি ব্যাটারির ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যোগ কর। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তার এক বা একাধিক পাত একটি ধাতব দণ্ড থেকে তড়িৎ বিশ্লেষক কোষের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হয়। রূপোর প্রলেপন দেওয়ার সময়, দ্রবণ হিসেবে সিলভার নাইট্রেট ($AgNO_3$) ব্যবহার করা হয়। এই দ্রবণের মধ্যে রূপোর পাত এবং ছুড়ি, চামচ ডোবান থাকে। এরপর ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে দিলে কিছু সময় পরে দেখতে পাবে রূপোর আস্তরণ ঐ ছুড়ি ও চামচের গায়ে পড়ে গেছে। কিছু বেশি সময় ধরে তড়িৎ পাঠানো হলে ছুড়ি ও চামচের গায়ে ভালভাবে রূপোর আস্তরণ পড়বে। এরপর ছুড়ি, চামচ বের করে এনে পরিস্রুত জলে ধুয়ে নাও।

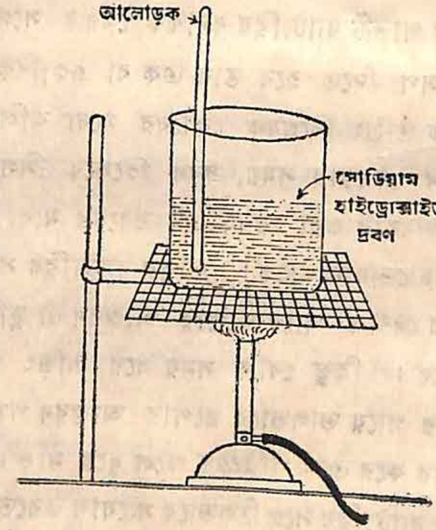
সতকর্তা ঃ ব্যাটারির সঙ্গে ঠিকভাবে সংযোগ করতে হবে। রূপোর পাতটি যেন ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যোগ করা থাকে। যেগুলির তড়িৎ লেপন করতে হবে সেগুলিকে ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ যদি একসঙ্গে কয়েকটি চামচের ওপর প্রলেপ দিতে চাও, তবে সেগুলিকে রডের সঙ্গে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

[ছাব্বিশ] সিন্থেটিক রবার প্রস্তুতি

একটি প্রচলিত সিন্থেটিক রবার হচ্ছে বিউটাইল রবার। এটি আইসোপ্রিন ও 2 মিথাইল প্রপিন থেকে প্রস্তুত করা হয়। আর একটি বেশ প্রচলিত সিন্থেটিক রবার আছে। সেটির নাম স্টাইরিন বিউটাডাইন (SBR)। এটি তৈরি করা হয় বিউটাডাইন (বিউট্ 1, 3 ডাইইন, $CH_2=CH—CH=CH_2$) এবং স্টাইরিনের পলিমার গঠন করে।

এছাড়া আর একটি সিন্থেটিক রবার হচ্ছে নিওপ্রিন। আমরা সহজ উপায়ে থায়োকল নামে একটা রবার প্রস্তুত করতে পারি। এটি আসলে একটি পলি-সালফাইড রবার।



সিন্থেটিক রবার প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) 3—4 গ্রাম কস্টিকসোডা (ii) বীকার (iii) জল (iv) সালফার পাউডার (v) বার্নার (vi) 10 সিসি ডাইক্লোরোইথেন।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : একটি বীকারে কস্টিক সোডা নিয়ে

50 সিসি মত জলে গুলে ফেল এবং তা ফোটাও কিছুক্ষণ ধরে। এতে 5 থেকে 6 গ্রাম মত সালফারের গুঁড়ো মেশাও এবং ভাল করে নাড়। এরপর ধীরে ধীরে 10 সিসি মত ডাইক্লোরোইথেন মেশাও। কিছুক্ষণ বাদে ওপরের তরল ছেঁকে নাও এবং হলুদ রঙের রবারের মত কঠিন পদার্থটি বারবার জল দিয়ে ধুয়ে নাও। এইভাবে রবার পাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সালফার গুঁড়ো ও ডাইক্লোরোইথেন দিয়ে রবার প্রস্তুত করা যায়।

সতর্কতা ঃ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেন পরিমাণ মত মেশান হয়। কস্টিক সোডার দ্রবণটি যেন ভালভাবে ফোটে। এই দ্রবণ যেন হাতে না লাগে, তাতে ঘা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রয়োজনীয় কথা ঃ সালফার, গরম কস্টিক সোডা দ্রবণে মিশে Na_2S_4 নামে একটি যৌগ গঠন করে। এটি ক্লোরোইথেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রবার (এখানে থায়োকল রবার) উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি নিচের মত করে লেখা যায়।

$$n\begin{array}{l}CH_2Cl\\|\\CH_2Cl\end{array} + n\,Na_2S_4 \rightarrow \underset{\text{থায়োকল}}{(-CH_2-CH_2-S-S-S-S)n} + 2n\,NaCl$$

বিক্রিয়াতে যে লবণ তৈরি হয়, তা বারবার জল দিয়ে ধুলে চলে যায়। উৎপন্ন থায়োকলটি জৈব দ্রব্যকে সহজে নষ্ট হয় না।

[সাতাশ] সিন্থেটিক ডিটারজেণ্ট প্রস্তুতি

ডিটারজেণ্টের কাজ হচ্ছে কোন কিছু পরিষ্কার করা। এটি জলের মধ্যে গুলে নিয়ে তবে ব্যবহার করতে হয়। দু'ধরনের ডিটারজেণ্ট আছে। সাবান এবং সাবানহীন (সিন্থেটিক)

ডিটারজেন্ট। সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট প্রস্তুত করতে সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়।

সাবানের সঙ্গে সিন্থেটিক ডিটারজেন্টকে আলাদা করা যায় তাদের রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে। সাবান বলতে বোঝায়— কার্ব-অক্সালিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে। এবং সাবান তৈরি হয় প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ তেল এবং ফ্যাটের সাবানীভবন প্রক্রিয়ায়।

সাবান খর জলে সহজে ফেনা উৎপন্ন করতে পারে না। অর্থাৎ খর জলে সাবান অতিরিক্ত খরচ হয় এবং কাপড় জামা অপরিষ্কার থেকে যায়। সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে এই অসুবিধা দূর হয় অর্থাৎ খরজলে ও ফেনা সৃষ্টি হয়।

সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট প্রস্তুত করা হয় পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ থেকে। একটি সিন্থেটিক ডিটারজেন্টের প্রস্তুত পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) টেস্ট টিউব ও বীকার (ii) কিছুটা ক্যাস্টর তেল (iii) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (iv) জল।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : একটি টেস্ট টিউব নাও এবং তাতে 0·5 সিসি ক্যাস্টর অয়েল (তেল) নাও এবং তাতে ধীরে ধীরে 1 সিসি মত ঘন H_2SO_4 মিশিয়ে ভাল করে নাড়াও। এরপর মিশ্রণটি একটি বীকারে রাখা 50 সিসি জলের মধ্যে ঢাল ও আস্তে আস্তে নাড়াও। এতে অল্প অল্প করে জল মেশাও যাতে বাড়তি অ্যাসিড না থাকে। এই মিশ্রণের কিছুটা নিয়ে তাতে অল্প জল মেশাও ও জোরে ঝাঁকাও। দেখবে সাবানের মত ফেনা তৈরি হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত : ক্যাস্টর তেল ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশে ডিটারজেন্ট তৈরি হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় কথা : সাবানের মূল যে গঠনের জন্য তা

জলে দ্রবীভূত হয় সেটি হল—COONa এবং সিন্থেটিক ডিটারজেন্টে থাকে—SO_3Na এবং এই গ্রুপটি হচ্ছে সালফোনেট গ্রুপের Na লবণ। তেলে এই সালফোনেট গ্রুপ আসে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা। সালফোনিক অ্যাসিডকে NaOH দিয়ে প্রশমিত করলে Na সালফোনেট উৎপন্ন হয়। এবং এই Na সালফোনেটই হচ্ছে সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট। জলের সঙ্গে এটি মিশিয়ে ঝাঁকালে ফেনার সৃষ্টি হয়। সোডিয়াম অ্যালকিল বেনজিন সালফোনেট হচ্ছে একটি সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট।

[আঠাশ] ডিটারজেন্ট পাউডার

ডিটারজেন্ট আজকাল খুবই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ডিটারজেন্ট তৈরি করা হয় মূলতঃ স্নেহজ অ্যাসিড (ফ্যাটি অ্যাসিড) থেকে। জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যে জৈব লবণ তৈরি হয় তাকে ডিটারজেন্ট বলে। সোডিয়াম স্টিয়ারেট হচ্ছে একটি ডিটারজেন্ট। এটি প্রস্তুত করা হয় স্টিয়ারিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ার দ্বারা। কোন ময়লা কাপড় ডিটারজেন্ট মেশানো জলে দিলে, ডিটারজেন্ট অণুগুলি তার গায়ে একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে। অল্প গরম জল ব্যবহার করলে চর্বি জাতীয় ময়লা সহজে কাপড় ছেড়ে আসে। বাজারে যে সব ডিটারজেন্ট পাউডার পাওয়া যায়, সেগুলির সঙ্গে ডাইসোডিয়াম ফসফেট ও অল্প পরিমাণ পারবোরেট মেশান থাকে। পারবোরেটের মধ্যে সাধারণত সোডিয়াম পারবোরেট থাকে। এটি বিরঞ্জক পদার্থ হিসেবেও কাজে আসে। ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরির জন্য প্রয়োজন—

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) কাপড় কাচা সাবান (ii) সোডিয়াম সিলিকেট (iii) সোডিয়াম কার্বনেট (iv) বোরাক্স পাউডার।

প্রস্তুত প্রণালী : কিছু শক্ত কাপড় কাচা সাবান নিয়ে তা

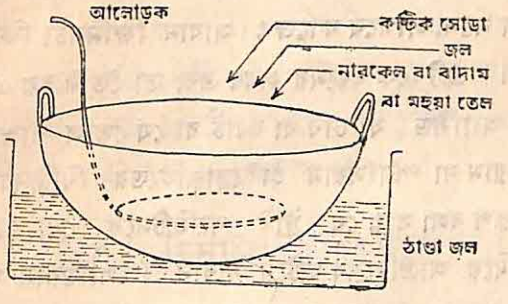
ছোট ছোট টুকরো করে কাট। সেগুলি কয়েক ঘণ্টা ধরে রোদে শুকিয়ে নাও আর ভাল করে গুঁড়ো পাউডারের মত কর। এর মধ্যে সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম কার্বনেট এবং বোরাক্স পাউডার মেশাও। পরীক্ষার সময় 50 গ্রাম কাপড় কাচা সাবান নাও, এবং তার সঙ্গে 20 থেকে 22 গ্রাম মত সোডিয়াম সিলিকেট, 30 গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট এবং 10 গ্রাম মত বোরাক্স পাউডার নিয়ে মিশ্রণটি ভাল করে মেশাও। এইভাবে ডিটারজেন্ট পাউডার পাবে।

প্রয়োজনীয় কথা : ডাই সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেটকে বিল্ডার বলে। বাজারের ডিটারজেন্ট পাউডারে এই বিল্ডারটি অল্প পরিমাণে মেশান থাকে। কখনও কখনও ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট মেশান হয়। ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট খর জলে খুব কার্যকরী হয়।

[উনত্রিশ] সাবান তৈরির নিয়ম

সাবান তৈরি করতে গেলে দরকার হয় তেলের। যে ধরনের সাবান চাও, তার জন্য চাই সেই ধরনের তেল ও বিশেষ গন্ধযুক্ত দ্রব্য। ভারতে টয়লেট সাবান তৈরি করা হয় নারকেল তেল থেকে। দক্ষিণ ভারতে এই তেল বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। সাবান তৈরি করা যায় দু'ভাবে। ঠাণ্ডা আর গরম পদ্ধতিতে। গরম পদ্ধতিতে ফ্যাটকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে ফুটিয়ে সাবান তৈরি করা হয়। আর ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে জিনিসগুলোকে ঠাণ্ডা অবস্থায় ভালভাবে মেশাতে হয়। টয়লেট সাবান তৈরি করতে হয় গরম বা উষ্ণ পদ্ধতিতে আর কাপড় কাঁচা সাবান তৈরি হয় ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে। কাপড় কাঁচা সাবান কিভাবে তৈরি করবে তা এবার বলি। এর জন্য প্রয়োজন—

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ (i) লোহার কড়াই, (ii) কস্টিক সোডা (25 থেকে 30 গ্রাম) (iii) জল (iv) নারকেল তেল বা বাদাম তেল



সাবান প্রস্তুত করা হচ্ছে

বা মহুয়া তেল। (v) আলোড়ক বা নাড়ানোর জন্য কাচের রড। (vi) ছাঁচ।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ একটি লোহার কড়াইয়ে 25 থেকে 30 গ্রাম কস্টিক সোডা নাও এবং জল মেশাও (100 থেকে 150 মিলির মত) এবং একটি কাচদণ্ড দিয়ে নাড়। এতে কষ্টিক সোডার দানাগুলো জলে গুলে যাবে। এর মধ্যে ওপরের যে কোন একটি তেল (125 গ্রাম থেকে 150 গ্রাম) মত মেশাও। এরপর দ্রবণটি ঠাণ্ডা করে ভালভাবে নাড়তে থাক। দেখবে সাবান হতে আরম্ভ করেছে এবং শক্ত যে সাবান পাবে তা বার সাবানের মত কেটে নাও এবং শুকিয়ে নাও। সাবান যখন ঘন হয়ে আসবে তখন ইচ্ছে মত ছাঁচে ফেললে, সাবানকে ঐ ছাঁচের আকারে পেয়ে যাবে। বেশি সাবান পেতে জলে কস্টিক সোডা ও তেল উপযুক্ত পরিমাণে নিতে হবে।

সাবধানতা ঃ (i) কাচের পাত্র ব্যবহার না করে লোহার পাত্র ব্যবহার করবে। কাচের পাত্রে কস্টিক সোডা রাখলে, পাত্র নষ্ট হয়ে যায়।

(ii) কস্টিক সোডা যেন হাতে না লাগে, কারণ তা চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে।

(iii) সাবানে কোন ক্ষতিকারক রঙ মেশাবে না।

রাখলে মনে, লাগবে কাজেঃ সাবান জিনিসটা কি তা এবার জানা যাক। এটি এক ধরনের লবণ এবং তা তৈরি হয় এক ধরনের জৈব ফ্যাটি অ্যাসিড (যা চর্বি বা ফ্যাট বা যে তেলে পাওয়া যায়) এবং সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ার দ্বারা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ট্রাই পামিটিনকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষ ঘটিয়ে সাবান (সোডিয়াম পামিটেট) পাওয়া যায়। এবং সেই সঙ্গে উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় গ্লিসারিন। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করে যে সব সাবান তৈরি করা হয়—সেগুলি একটু শক্ত ধরনের হয়, কিন্তু পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করলে উৎপন্ন সাবান নরম হয় এবং তা জলে বেশি দ্রবণীয়। এগুলি প্রধানত দাড়ি কামানো বার সাবান, ক্রীম ও শ্যাম্পু তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। প্রসাধনী (টয়লেট) সাবান তৈরিতে ভারতে নারকেল তেলই প্রধানত ব্যবহার করা হয়। সাবান তৈরিতে যে সব তেল ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে তিলের তেল, তালের তেল, বাদাম তেল, তিসির তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় প্রাণিজ তেলও ব্যবহার করা হয় এবং এর জন্য প্রধানত শুশুকের তেল, গরু-মোষ, তিমি ও অন্যান্য মাছের তেল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বেশি করে, এইসব তেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাবান তৈরি করা হচ্ছে কারণ নারকেল, তিল বা তিসির তেল ভোজ্য পদার্থ হিসেবেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়। নিম তেল, তামাক বীজের তেল প্রভৃতি থেকেও আজকাল আমাদের দেশে সাবান তৈরি করা হয়। বাদাম বা তিসির তেলের থেকে যে সাবান পাওয়া যায়, তা হয় খুব নরম এবং তার ফেনাও হয় কম।

ময়লা দূর করতে সাবান কিভাবে কাজ করে তা এবার জানা

যাক। যে ময়লা কাপড় বা শরীরে আসে সেগুলি জমা হয় এক ধরনের চটচটে পদার্থের সাহায্য নিয়ে। যখন সাবান দিয়ে সেই সব জিনিস ঘষা হয়, তখন এই চটচটে পদার্থটি ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং সে কাজ দু'ভাবে হয়। (i) এটি গ্রীজের সঙ্গে ইমালসন গঠন করে এবং তাতে ময়লাগুলি গ্রীজ থেকে আলগা হয়ে যায় এবং (ii) সাবান জলের সঙ্গে একটি কোলয়েড দ্রবণ সৃষ্টি করে এবং ময়লা এই দ্রবণের কণার ওপর ভাগে শোষিত হয়।

[ত্রিশ] ফিনাইল তৈরির নিয়ম

ফিনাইল কি কাজে লাগে তোমরা জান। কোন দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে এটি ছিটিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া মাছি ও পোকামাকড় তাড়াতে ফিনাইল জল দিয়ে ঘরের মেঝে মোছা হয়। বীজাণু ধ্বংস করতে হাসপাতালে ফিনাইল খুবই ব্যবহার করা হয়।

সাবান তৈরির নিয়মটা তোমরা শিখে নিয়েছ, এবার শিখে নাও ফিনাইল তৈরি করতে। সাবান তৈরির জন্য যা যা লাগে, তার সঙ্গে আর একটা জিনিস যোগাড় করতে হবে যার নাম ক্রিয়োজোট তেল। এই কয়েকটি জিনিস যোগাড় হলেই ফিনাইল তৈরি করার আর কোন বাধা থাকবে না। অর্থাৎ ফিনাইল তৈরিতে লাগবে (i) কস্টিক সোডা (ii) তেল এবং (iii) রজন।

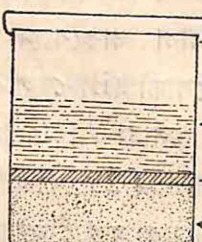
প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ একটি লোহা বা এনামেলের পাত্রে রজন (250 গ্রাম) এবং কস্টিক সোডা (25 থেকে 30 গ্রাম) নাও। এর মধ্যে 350 থেকে 400 সিসির মত ক্রিয়োজেট তেল নাও এবং ধীরে ধীরে 2 লিটার জল মেশাও। একটি আলোড়ক দিয়ে ভালকরে মিশিয়ে নিলেই ফিনাইল তৈরি হয়ে যাবে। এই ফিনাইল বেশ ঘন হয়। এবার কাজের সময় প্রায় 7 থেকে 8 চামচ (চায়ের চামচ) ঘন ফিনাইল 500 সিসি জলে মিশিয়ে লঘু ফিনাইল তৈরি করতে পার।

[একত্রিশ] তরল পর্দা ও জলের প্রবেশ

তোমরা নানা ধরনের পর্দা দেখেছ। সে সব পর্দা মূলতঃ কাপড় বা কাগজের হয় এবং তা কঠিন পদার্থ। কিন্তু তরল পদার্থ কি কখনও পর্দার কাজ করতে পারে? পারে। তবে তার উদাহরণ হয়ত বেশি পাওয়া যাবে না। একটা পরীক্ষা করে তোমরা সহজেই এরকম পর্দা তৈরি করতে পার যার ভেতর দিয়ে জল ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই আর তোমরা ঠিক সেই অনুযায়ী জিনিসগুলো যোগাড় করে পরীক্ষা করলে, তরল পর্দা বা ঝিল্লীর কাজ সহজেই দেখতে পাবে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ (1) বড় বীকার, (2) একটা পিপেট (3) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ, (4) ফেনল।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ একটি বড় বীকার নাও ও তার মধ্যে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট (300 সিসি) এবং প্রায় 50 থেকে 60 সিসি মত ফেনল ঢাল। কিছুক্ষণ পর দেখবে যে দুটি তরল যেন দুটি আলাদা স্তরে রয়েছে। নিচের অংশে থাকবে ফেনল সম্পৃক্ত কালসিয়াম নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ এবং ওপরের অংশে জল সম্পৃক্ত



তরল পর্দা ও জলের প্রবেশ

ফেনল। এবার একটা পিপেটের সাহায্যে অল্প পরিমাণ ফেনল মিশ্রিত জল যদি ওপর থেকে ধীরে ধীরে ঢালতে শুরু কর তবে দেখবে ফেনল যেন একটা তরল পর্দার কাজ করছে, যার ওপরে

আছে জল আর নিচে আছে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ। এরপর বীকারের মুখটি ঢেকে দিয়ে 3-4 দিন অপেক্ষা করে দেখ যে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। ব্যাপারটা হলো ফেনলের ওপরের জল মাঝের পর্দা (অর্থাৎ ফেনল) ঠেলে নিচের ক্যালসিয়াম নাইট্রেটে মিশে গেছে। অর্থাৎ এরপর দুটি তরলের স্তর গঠন হয় যার নিচে থাকে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং ওপরে থাকে ফেনল।

সিদ্ধান্ত : জল ফেনলের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে নিচের দ্রবণে আসতে পারে কিন্তু ক্যালসিয়াম নাইট্রেট দ্রবণটি ওপরে উঠতে পারে না।

কেন এমন হয় ?—ফেনল এখানে তরল পর্দার কাজ করছে এবং এর ভেতর দিয়ে পরিস্রুত জল ধীরে ধীরে নিচের দিকে অসমোসিস প্রক্রিয়ায় চলে যায়। কিন্তু ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ফেনলে অদ্রবণীয় হওয়ায় ফেনলের ভেতর দিয়ে ওপরের জলে মিশতে পারে না। ক্যালসিয়াম নাইট্রেট দ্রবণের ঘনত্বও ফেনলের চেয়ে বেশি, তাই এই দ্রবণটি সব সময় নিচেই থাকতে চায় আর ফেনল এর ওপরে থাকে।

আরও কিছু কথা : ফেনল এখানে অর্ধভেদ্য পর্দা বা ঝিল্লীর কাজ করে যার ভেতর দিয়ে দ্রাবক (এখানে জল) প্রবেশ করতে পারে কিন্তু দ্রবণ (এখানে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট) প্রবেশ করতে পারে না। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল ফেনলের মধ্য দিয়ে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটে মিশছে, সেই প্রক্রিয়াটির নাম অসমোসিস। এখানে পর্দাটিকে ঠিক অর্থে ঝিল্লী বলা উচিত।

[বত্রিশ] আয়োডেক্সের গন্ধ

বুকে পিঠে ব্যথা হলে অনেকেই আয়োডেক্স মালিশ করেন। এই আয়োডেক্সের একটি বিশেষ ধরনের সুগন্ধ আছে। তোমরা যদি নিজেরা এই গন্ধ সৃষ্টি করতে চাও, তবে কয়েকটি জিনিস যোগাড় কর।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য। (i) মিথাইল অ্যালকোহল (ii) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (iii) স্যালিসাইলিক অ্যাসিড (iv) বার্নার বা স্টোভ,

যে ভাবে গন্ধ পাবে ঃ একটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমাণ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড নাও (আন্দাজ পরিমাণে 1 গ্রামেরও কম নিলে চলবে)। এতে প্রায় 3 সিসি মিথাইল অ্যালকোহল মেশাও এবং ভালকরে ঝাঁকাও। এরপর প্রায় 2 সিসি পরিমাণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও এবং বার্নার দিয়ে অল্প গরম কর। সঙ্গে সঙ্গে একটা সুগন্ধ অনুভব করবে এবং গন্ধটা যে আয়োডেক্সের তা আর বলে দিতে হবে না। উৎপন্ন যৌগের নাম মিথাইল স্যালিসাইলেট। এই পরীক্ষাটি অয়েল অফ উইন্টার গ্রীন টেস্ট নামে পরিচিত।

সিদ্ধান্ত ঃ মিথাইল অ্যালকোহল, ও স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, অল্প সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে সামান্য তাপেই এমন একটি যৌগ উৎপন্ন করে, যার গন্ধ আয়োডেক্সের মত।

[তেত্রিশ] যে মলম ঘা সাড়ায়

তোমাদের নানান জিনিস তৈরি করতে শিখিয়েছি। এবার এমন একটা মলম তৈরি করতে শেখাব যা তোমাদের খুবই কাজে লাগবে। শরীরের চামড়ায় যদি সাধারণ ঘা হয়, তবে সেই ঘা সাড়াতে এই মলম কাজে লাগান যাবে। তখন আর ডাক্তারের কাছে ছুটে না গেলেও চলবে। দোকান থেকে ট্যাবলেট বা মলম কিনে তোমরা ঘা সাড়াতে পার—একথা ঠিক। তবে নিজেরা যদি মলম তৈরি করে তা দিয়ে ঘা সাড়াতে পার তবে কত আনন্দ হবে বলতো। বেশি পরিমাণ মলম তৈরি করে যদি ছোটখাট ব্যবসা করতে চাও তবে দেখবে অনেক কম খরচেই মলম তৈরি হচ্ছে এবং মলম বিক্রি করে বেশ লাভ করা যাচ্ছে। তবে

ব্যবসা করতে হলে ব্যবসার নিয়মগুলো জেনে নিয়ে তবে একাজে নামবে। এবার কিভাবে মলম তৈরি করবে এবং তার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি কি, তা জানাই।



ক্ষতস্থানে মলম লাগান হচ্ছে

উপকরণ : (i) ফটকিরি→35 থেকে 40 গ্রাম

(ii) সোরা →35 থেকে 40 গ্রাম

(iii) জিংক অক্সাইড →35 থেকে 40 গ্রাম

(iv) অলিভ অয়েল →10 থেকে 12 সিসি

(v) ইয়োলো ভেসলিন →200 গ্রাম

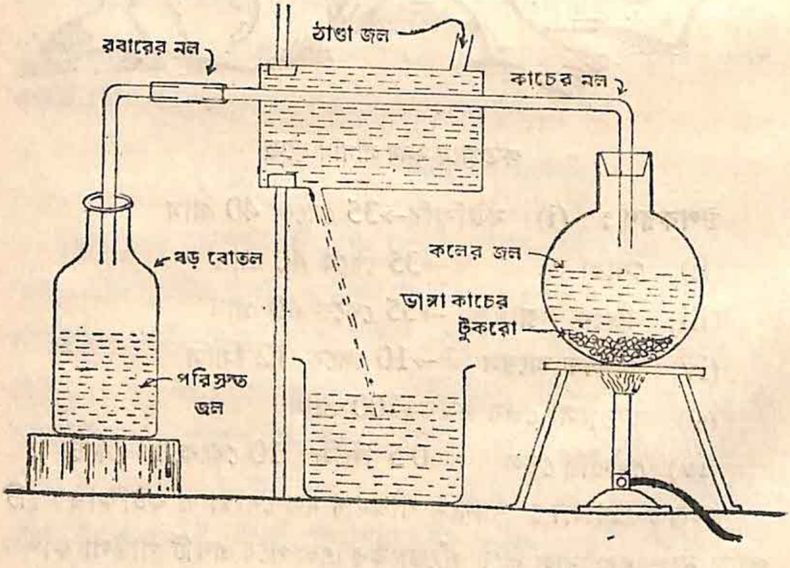
(iv) মৌরীর তেল →0·5 সিসি (10 থেকে 12 ফোঁটা)

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে পরিমাণ মত সোরা ও ফটকিরি দুটি পাত্রে নাও এবং ভাল করে গুঁড়ো কর এবং পরে একটি পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নাও। এরপর পাথরের একটা বড় বাটিতে জিংক অক্সাইড, সোরা ও ফটকিরির গুঁড়ো নাও এবং তাতে ইয়োলো ভেসলিন মেশাও। মিশ্রণটি ভাল করে নাড় এবং তাতে প্রথমে

অলিভ তেল ও পরে মৌরীর তেল মেশাও এবং আবার ভালকরে নাড়। কিছুক্ষণ পরে দেখবে পেস্টের মত নরম মলম তৈরি হয়েছে। ছোট ছোট টিনের কৌটোয় ভরে ফেল।

[চৌত্রিশ] ডিসটিলড্ ওয়াটার প্রস্তুতি

কলের জলে, পুকুরের জলে সাধারণত নানা লবণ দ্রবীভূত থাকে। জলকে এইসব লবণমুক্ত করার জন্য যে পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়, তাকে পরিস্রাবণ (Distillation) বলে। এই পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রথমে অপরিস্রুত জল একটা ফ্লাস্কে নেওয়া হয় এবং তা ফুটিয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং পরে সেই বাষ্পকে আবার ঠাণ্ডা করে পরিস্রুত জল পাওয়া যায়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন—



ডিসটিলড্ ওয়াটার প্রস্তুতি

উপকরণ : কলের জল (ii) বড় কাচ বা তামার গোলতল ফ্লাস্ক (iii) কিছু কাচ বা ভাঙ্গা পোর্সেলিনের টুকরো (iv) বোতল

বা কনিক্যাল ফ্লাস্ক (v) বার্নার (vi) বাঁকান কাচের নির্গম নল। (vii) ঠাণ্ডা করার জন্য একটি বড় পাত্র। (viii) অল্প পরিমাণ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

প্রস্তুত পদ্ধতি : গোলতল ফ্লাস্কের মধ্যে কলের জল ও অল্প পরিমাণ $KMnO_4$ নাও। এর মধ্যে কিছু ভাঙ্গা কাচের টুকরো বা ভাঙ্গা পোর্সেলিনের টুকরো দিয়ে দাও। ফ্লাস্কের মুখে কর্ক লাগিয়ে একটা নির্গম নল লাগাও এবং সেই নির্গমনলটি একটি বড় পাত্রের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাও। ওপরের একটা প্রবেশ পথ দিয়ে পাত্রটির মধ্যে ঠাণ্ডা জল ফেলার ব্যবস্থা রাখবে এবং সেই জল নিচের দিক দিয়ে বার করে দেবে।

নির্গম নলটির সঙ্গে একটা রবারের নল জুড়ে দেবে। এই রবারের নলের সঙ্গে আর একটা কাচের নল লাগিয়ে দাও। এই নলটির খোলা মুখটা একটা বড় বোতল বা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মুখে ঢুকিয়ে দাও। বোতলটা প্রয়োজন হলে একটু উঁচুতে রাখবে। কয়েকটা ইট পেতে বোতলটা উঁচুস্থানে রাখতে পার। এই ব্যবস্থা করার পর বার্নার দিয়ে ফ্লাস্কের জল ফোটাতে থাক। কিছুক্ষণ পর দেখবে যে বোতলে পরিস্রুত জল পাওয়া যাচ্ছে।

সতর্কতা : (i) ফ্লাস্কের মুখটি ভালকরে বায়ুরুদ্ধ করবে। (ii) ফ্লাস্কের মধ্যে কাচ বা পোর্সেলিন টুকরো দিয়ে রাখবে, নতুবা ফ্লাস্কটা মাঝে মধ্যে লাফিয়ে উঠতে পারে বা নড়ে চড়ে যেতে পারে!

আরও কিছু কথা : জলকে প্রথমে ফুটিয়ে বাষ্প করা হয় এবং সেই বাষ্পকে আবার ঠাণ্ডা করে পরিস্রুত জল পাওয়া যায়। খুব বিশুদ্ধ জল পেতে হলে প্রথমবারে যে বিশুদ্ধ জল এই প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়, সেই জল নিয়ে আরেক বার একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে প্রাপ্ত পরিস্রুত জল স্বাদহীন হয় অর্থাৎ এতে কোন লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে না।

নির্গম নলটিকে ঠাণ্ডা করার জন্য মাটির পাত্র তৈরি করিয়ে নিতে পার যার তুদিকে তুটো ফুটো থাকবে। এই ফুটোর মধ্যে নির্গম নলটি ঢুকিয়ে ফুটো তুটো বন্ধ করে দিতে হবে এবং মাটির পাত্রে ঠাণ্ডা জল বারবার পাল্টে নলটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। পরিস্রুত জল কাচের জারে সংগ্রহ করে রাখবে। তবে কাচের জার – ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, তাই পলিথিনের জারে এই জল রাখার ব্যবস্থা করবে।

ল্যাবরেটরীর বিভিন্ন রিয়েজেন্ট (বিকারক) ও দ্রবণ তৈরি করতে এবং ওষুধ শিল্পে পরিস্রুত জল ব্যবহার করা হয়।

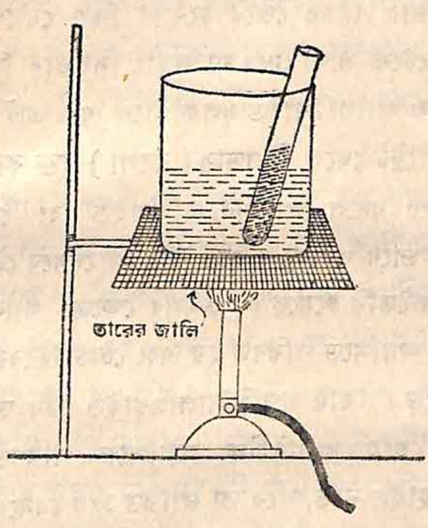
[পঁয়ত্রিশ] টেস্টটিউব আয়না

তোমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচরাও। আয়নায় নিজের ছবি (প্রতিবিম্ব) দেখে নিজেকে ফিটফাট রাখতে পার। তবে এমন আয়না করা বেশ কঠিন ব্যাপার। এইসব আয়না সমতল কাচের ওপর তৈরি করা হয়। এখন কাচের টেস্ট টিউবের গায়েও তুমি এক ধরনের আয়না তৈরি করতে পার যা খুব সুন্দর দেখায়। এই আয়নাতেও তুমি নিজের মুখ দেখতে পার। এই টেস্ট টিউব আয়না তৈরি করতে হলে নিচের উপকরণগুলি যোগাড় করে ফেল।

উপকরণ : (1) কাচের তুটি টেস্ট টিউব (ii) অল্প পরিমাণ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (iii) অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ (iv) একটা বীকার ও জল (v) স্টোভ বা স্পিরিট ল্যাম্প (vi) গ্লুকোজ (vii) লঘু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ।

কর কাজ, দেখ মজা : প্রথমে টেস্টটিউবটির মধ্যে কিছুটা (2-3 গ্রাম) গ্লুকোজ নাও এবং তাতে জল দিয়ে ঝাঁকাও। গ্লুকোজ গুলে যাবে ও একটি দ্রবণ তৈরি হবে। আর একটি টেস্টটিউবে 2-3 সিসি সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ নাও এবং তাতে 2-3 ফোঁটা লঘু

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশাও। দেখবে একটা কালচে সাদা অধঃক্ষেপ পড়বে [অধঃক্ষেপটি হচ্ছে সিলভার অক্সাইডের (Ag_2O)]। এই অধঃক্ষেপের মধ্যে অল্প পরিমাণ লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ মেশাও এবং দ্রবণটি নাড়। দেখবে, ঐ অধঃক্ষেপটি দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এই দ্রবণটির নাম অ্যামোনিয়াক্যাল সিলভার নাইট্রেট বা টোলেনের বিকারক।



টেস্টটিউব আয়না পরীক্ষা

এবার প্রথম টেস্টটিউবের গ্লুকোজ দ্রবণে এই অ্যামোনিয়াক্যাল সিলভার নাইট্রেট দ্রবণটি মেশাও এবং টেস্টটিউবের মিশ্রণটি জল-গাহে (water-bath) 5 মিনিট গরম কর (একটি বীকারের মধ্যে অর্ধেক জল রেখে গরম করে তার মধ্যে টেস্টটিউবটি বসাতে হবে)। কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পাবে টেস্টটিউবের ভেতরের গায়ে রূপোর চকচকে প্রলেপ পড়েছে। এই প্রলেপের জন্য টেস্টটিউব আয়নার সৃষ্টি হয়। টেস্টটিউব থেকে দ্রবণটা ফেলে দিয়ে দেখ কি সুন্দর আয়না তৈরি হয়েছে।

কেন এমন হয়? গ্লুকোজ দ্রবণে অ্যালডিহাইড মূলক থাকে,

যা অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেট থেকে সিলভারের (রূপো) অধঃক্ষেপ ফেলে। গরম অবস্থায় এই অধঃক্ষেপ ভাল হয়, তবে টেস্টটিউবটি সরাসরি গরম না করে জলগাহে গরম করা ভাল।

রাখলে মনে, লাগবে কাজে : টোলেন বিকারক দিয়ে এই পরীক্ষা করে অ্যালডিহাইড ও কিটোনের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। জৈব যৌগে অ্যালডিহাইড মূলক থাকলে, এই পরীক্ষায় সাড়া দেবে। অর্থাৎ সিলভার মিরর তৈরি হবে। কিন্তু যৌগে কিটোন মূলক থাকলে এই টেস্টে সাড়া দেবে না অর্থাৎ সিলভার মিরর তৈরি হবে না। গ্লুকোজে অ্যালডিহাইড মূলক থাকে এবং এটি অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেট থেকে সিলভার (রূপো) মুক্ত করে।

গ্লুকোজের বদলে অ্যাসিট্যালডিহাইড বা বেনজ্যালডিহাইড নিয়েও একইভাবে পরীক্ষা করতে পার। দেখবে টেস্টটিউবের গায়ে সুন্দর আয়না তৈরি হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে, অ্যালডিহাইড যৌগ জারিত হয়ে অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং টেস্টটিউবের গায়ে সিলভার অধঃক্ষেপ পড়ে। যদি অ্যাসিট্যালডিহাইড জৈব তরলটি নাও তবে তা জারিত হয়ে অ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং যদি বেনজ্যালডিহাইড নাও, তবে তা জারিত হয়ে বেনজোয়িক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন টারটারিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে, টোলেন বিকারক থেকে ঐ অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ধাতব সিলভার উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই বিক্রিয়া দিয়ে অ্যালডিহাইডের নিশ্চিত উপস্থিতি সব সময় প্রমাণ করা যায় না।

[ছত্রিশ] দাহ্য থেকে অদাহ্য

একটি ফিল্টার পেপার নিয়ে মোমবাতির শিখায় ধর, দেখবে কাগজটি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এখন তোমাকে এমন এক পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারি যাতে ফিল্টার পেপার, ব্লটিং পেপার

প্রভৃতি মোমবাতির শিখার ওপর ধরলেও তা পুড়বে না। [সাধারণ একজন স্ত্রীলোক যখন আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে, তখন তার শরীর পুড়ে যায়, কিন্তু রামায়ণে আছে সীতা আগুনে প্রবেশ করেও তার শরীর অক্ষত ছিল। অর্থাৎ সাধারণ স্ত্রীলোক দাহ্য, আর সীতা ছিলেন অদাহ্য।]

দাহ্য বস্তুকে অদাহ্য করার জন্য নিচের পদার্থগুলি যোগাড় কর।

উপকরণ ঃ (i) কয়েকটা ব্লটিং বা ফিল্টার পেপার (ii) অ্যামোনিয়াম সালফেট (iii) বোরাক্স এবং সমপরিমাণ বোরিক অ্যাসিড (iv) একটি বড় কাচের বীকার (v) জল, (vi) মোমবাতি।

কর কাজ, দেখ মজা ঃ একটি বড় বীকার নাও এবং তাতে প্রায় 100 সিসি জল নাও এবং তার মধ্যে দশগ্রাম মত **অ্যামোনিয়াম সালফেট**, 2 গ্রাম **বোরাক্স** ও সমপরিমাণ **বোরিক অ্যাসিড** নাও এবং ভাল করে নাড়িয়ে একটি দ্রবণ তৈরি কর। এই দ্রবণটিই হচ্ছে সেই দ্রবণ যা কাগজকে অদাহ্য করতে পারে। এরপর ফিল্টার পেপারটি এই দ্রবণে ভাল করে ভেজাও এবং তা রোদে ভাল করে শুকিয়ে নাও। এইভাবে অন্তত তিনবার ফিল্টার পেপারটি প্রথমে দ্রবণে ভিজিয়ে ও পরে শুকিয়ে নাও। এরপর দ্রবণ মেশানো ফিল্টার পেপার মোমবাতির শিখায় ধর। দেখবে ফিল্টার পেপারটিতে আগুন ধরছে না। অথাৎ ফিল্টার পেপারটি অদাহ্য হয়ে গেছে।

কেন এমন হয়

ব্লটিং কাগজ বা সাধারণ কাগজে অসংখ্য ছোট ছোট ছেঁদা থাকে। কাগজের এই ছেঁদাগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে কাগজটি সহজে পুড়বে না। বোরিক অ্যাসিড, বোরাক্স এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট এই তিনটি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ যদি জলে গুলে নেওয়া হয় তবে এমন একটি দ্রবণ তৈরি হয়, যা ঐ

কাগজের ওপর একটি আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণের জন্য কাগজের ছেঁদাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দ্রবণে সিক্ত কাগজ মোমবাতির আগুনে পুড়বে না। পোড়ার কাজে বায়ুর যে অক্সিজেন কাগজের দরকার তা সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হয়, সেজন্য কাগজটি জ্বলে না।

আরো কিছু কথা : সাধারণত প্রতি পদার্থের একটি জ্বলনবিন্দু থাকে। কাগজেরও একটি জ্বলনবিন্দু আছে, যার মান খুব কম। সেজন্য সাধারণ কাগজ কম উষ্ণতায় জ্বলে। কিন্তু ঐ দ্রবণে কাগজ সিক্ত করে শুকিয়ে নিলে যে আবরণ পড়ে তাতে তার জ্বলনবিন্দু বেড়ে যায়, ফলে কাগজে আগুন ধরে না।

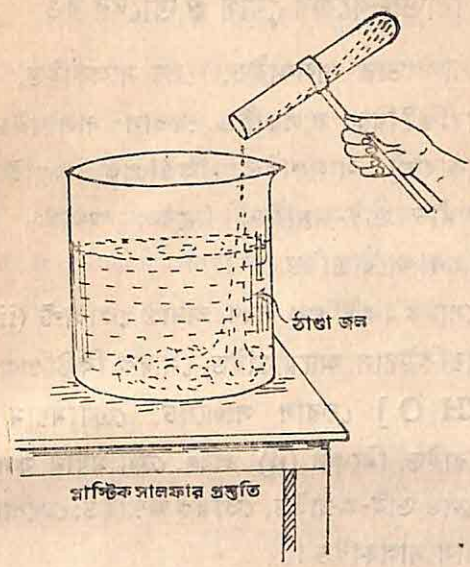
[সাঁইত্রিশ] প্লাস্টিক সালফার প্রস্তুতি

হলুদ রঙের গন্ধক (সালফার) তোমরা বোধহয় সবাই দেখেছ। এই গন্ধক বা সালফার থেকেই তোমরা প্লাস্টিক সালফার তৈরি করতে পারবে। প্লাস্টিক সালফার খুব নমনীয়। এই নমনীয় সালফার তৈরি করতে নিচের উপকরণগুলি যোগাড় কর।

উপকরণ : (i) একটি শক্ত টেস্টটিউব ও তার হোল্ডার (ii) অল্প পরিমাণ সালফার গুঁড়ো (iii) একটি কাচের বীকার (iv) ঠাণ্ডা জল (v) গরম করার জন্য স্টোভ বা স্পিরিট ল্যাম্প।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : প্রথমে শক্ত টেস্টটিউবটিতে সালফারের গুঁড়ো নাও এবং সেটি হোল্ডারের সাহায্যে ধরে ধীরে ধীরে গরম কর। দেখবে কঠিন সালফার গলে তরল হয়ে যাচ্ছে। এরপর আরো গরম কর। এতে তরল সালফার প্রায় ফুটতে থাকবে। এই সময় এর রঙ বাদামী হয়। বীকারে রাখা ঠাণ্ডা জলের মধ্যে গরম তরল সালফার ধীরে ধীরে কাত করে ঢাল। এই উত্তপ্ত ও গলিত তরল সালফার ঠাণ্ডা জলের মধ্যে এসে আঠালো এক নমনীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই নমনীয় পদার্থটিকে প্লাস্টিক বা গামা (γ)

সালফার বলে। পদার্থটি জলের থেকে ভারী ও জলে অদ্রবণীয় বলে জলের নিচে পড়ে থাকবে। জল কাত করে ফেলে দিলেই প্লাস্টিক



প্লাস্টিক সালফার প্রস্তুতি

সালফার পাওয়া যাবে। পদার্থটি এত নমনীয় যে এটিকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যায়। এটি দেখতে ছাইয়ের মত।

আরও কিছু কথা ঃ প্লাস্টিক সালফার অনিয়তাকার। এই পদার্থটি জলে বা কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রবীভূত হয় না। সাধারণ উষ্ণতায় রেখে দিলে, এটি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায় এবং রম্বিক সালফারে পরিণত হয়। রম্বিক সালফার নিয়তাকার। এর অপর নাম আলফা (α) সালফার। এটি 95·5°c-এর বেশি উষ্ণতায় নিজের রূপ পাল্টায় ও বিটা (β) রূপ নেয়। বিটা সালফারের আর একটি নাম মনোক্লিনিক সালফার। এটিও নিয়তাকার।

বিভিন্ন অজৈব যৌগ ও তাদের রঙ

কালো ঃ সিলভার সালফাইড, লেড সালফাইড, কিউপ্রিক সালফাইড, মারকিউরিক সালফাইড ফেরাস সালফাইড, নিকেল সালফাইড, কোবাল্ট সালফাইড, কিউপ্রিক অক্সাইড, ফেরাস অক্সাইড, ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড, নিকেল অক্সাইড, কিউপ্রিক ব্রোমাইড, নিকেল আয়োডাইড।

নীল ঃ সোদক কিউপ্রিক লবণ, অনার্দ্র কোবাল্ট (ii) লবণ।

সবুজ ঃ মারকিউরাস আয়োডাইড, সোদক কিউপ্রিক ক্লোরাইড [$CuCl_2$, $2H_2O$] ফেরাস সালফেট, ক্রোমিয়াম অক্সাইড, ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড, নিকেল (ii) লবণ, ক্রোমিয়াম ফসফেট।

বাদামী ঃ লেড ডাই-অক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড, ফেরোসোফেরিক অক্সাইড, স্ট্যানাস সালফাইড।

কমলা ঃ ডাইক্রোমেট লবণ, অ্যান্টিমণি সালফাইড।

লাল ঃ রেড লেড, মারকিউরিক অক্সাইড, মারকিউরিক আয়োডাইড, মারকিউরিক সালফাইড, কিউপ্রাস অক্সাইড।

হলুদ ঃ ক্যাডমিয়াম সালফাইড, টিন সালফাইড (SnS_2), লেড অক্সাইড, মারকিউরিক অক্সাইড, সোদক ফেরিক ক্লোরাইড, সিলভার আয়োডাইড, ফেরিক নাইট্রেট, ফেরিক সালফেট।

রঙীন দ্রবণ ও রাসায়নিক দ্রব্য

দ্রবণের বর্ণ, দ্রবণ লঘু হলে বোঝা যায় ভাল। লঘু দ্রবণে বিভিন্ন আয়নের জন্য বিভিন্ন রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়। দ্রবণে যদি একটি মাত্র যৌগ থাকে, তবে দ্রবণের বর্ণ দেখে অনেক সময় যৌগটি সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায়।

নীল : কপারের দ্রবণ (কিউপ্রিক আয়ন)

হলুদ : লোহা (ফেরিক আয়ন), ক্রোমেট, ফেরোসায়ানাইড যৌগ। ঘন HCl এর বর্ণ-অনেক সময় হলদে দেখতে হয়, যদিও HCl-এ ওপরের কোন আয়ন নেই।

কমলা : ডাইক্রোমেট লবণ।

সবুজ : লোহা (ফেরাস), নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতির দ্রবণ।

ফিকে লাল (Pink)—কোবাল্ট ; ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির দ্রবণ।

কয়েকটি বিশেষ বিকারক (reagent) তৈরির উপায়

(1) **ফেলিং দ্রবণ (A) :** 34·6 গ্রাম তুঁতে ($CuSO_4, 5H_2O$) প্রথমে কয়েক ফোঁটা ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত অল্প পরিস্রুত জলে গুলে নাও এবং তার মধ্যে আরও জল দিয়ে মোট আয়তন 500 সিসি কর।

(2) **ফেলিং দ্রবণ (B) :** রচেলী লবণ (Rochelle salt) 173 গ্রাম এবং 70 গ্রাম বিশুদ্ধ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) নিয়ে জলে দ্রবণ তৈরি কর এবং দ্রবণ আয়তন 500 সিসি কর।

(3) **আণুমানিক (N/10) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ :** 3·2 গ্রাম পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (আণবিক গুরুত্ব = 316) নিয়ে 1 লিটার জলে গুলে দ্রবণ তৈরি কর।

(4) **আণুমানিক (N/10) আয়োডিন দ্রবণ :** 20 গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডাইড 30 মিলি জলে গুলে ফেল এবং তাতে 13 গ্রাম মত আয়োডিন ধীরে ধীরে মেশাও এবং ভালকরে নাড়তে থাক। দ্রবণের মোট আয়তন যেন 1 লিটার হয়।

(5) **সঠিক (N/10) অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ :** 1·575 গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড ওজন কর এবং তা 250 সিসি ফ্লাস্কে নিয়ে প্রথমে জলে গুলে নাও এবং পরে আরও জল মিশিয়ে ফ্লাস্কের নির্দিষ্ট দাগ অবধি ভর্তি কর।

(6) **সঠিক (N/10) পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ :** 1·225 গ্রাম বিশুদ্ধ পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ওজন কর এবং তা 250 সিসি ফ্লাস্কে নিয়ে প্রথমে অল্প জলে গুলে নাও এবং পরে আরও জল মিশিয়ে ফ্লাস্কের নির্দিষ্ট দাগ অবধি পূর্ণ কর।

(7) 0·5 (N) **পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ :** 83 গ্রাম লবণ ওজন করে এবং তা জলে গুলে 1 লিটার দ্রবণ তৈরি কর।

(8) 0·5 (N) **ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ :** 135 গ্রাম ফেরিক ক্লোরাইড লবণ ($FeCl_3, 6H_2O$) নিয়ে জলের সাহায্যে 1 লিটার দ্রবণ তৈরি কর এবং এই দ্রবণ তৈরি করতে 20 থেকে 25 মিলি মত ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Conc. HCl) মেশাতে হবে।

(9) (N/10) **সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ :** 17 গ্রাম সিলভার নাইট্রেট নাও এবং জলে গুলে 1 লিটার দ্রবণ তৈরি কর।

(10) **ক্লোরিন জল :** 250 মিলি জল নিয়ে তার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস চালিয়ে সম্পৃক্ত কর। ক্লোরিন গ্যাস পাওয়া যাবে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সঙ্গে ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে। দ্রবণটি একটি রঙীন বোতলে রেখে দেবে। সম্পৃক্ত দ্রবণের প্রতি লিটারে 6·5 গ্রাম মত ক্লোরিন থাকে।

(11) **ব্রোমিন জল :** 11 মিলি তরল ব্রোমিন, জলের সঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকাও এবং পরে তা এক লিটার আয়তন কর।

(12) **সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড দ্রবণ :** এই বস্তুটির খুব ছোট এক টুকরো নিয়ে 4-থেকে 5 মিলি জলে গুলে ফেল।

(13) **স্টার্চ দ্রবণ :** 2 গ্রাম মত স্টার্চ অল্প ঠাণ্ডা জলে নিয়ে পেস্টের মতন কর এবং তাতে 100 মিলি ফুটন্ত গরম জল মেশাও। 5 মিনিট ধরে এই দ্রবণটি ফোটাও। দেখবে এক পরিষ্কার দ্রবণ পাওয়া গেল। এর মধ্যে 2 গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডাইড মেশাও এবং ঠাণ্ডা করে কর্কযুক্ত বোতলে রাখ এবং সবশেষে 2-3 ফোটা ক্লোরোফর্ম মেশাও। এই ভাবে ব্যবহার যোগ্য স্টার্চ দ্রবণ তৈরি হবে।

(14) **হলুদ অ্যামোনিয়াম সালফাইড** $(NH_4)_2S_x$ **:** 200 মিলি লিকার অ্যামোনিয়া দ্রবণ নাও এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় তার মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড পাঠাও। এর মধ্যে 10 গ্রাম মত সালফারের গুঁড়ো মেশাও এবং পরে আবার 200 মিলি লিকার

আমোনিয়া দ্রবণ মেশাও এবং ভাল করে ঝাঁকাও। ঝাঁকাবার ফলে সালফার গুলে যাবে। এরপর এই দ্রবণকে জল দিয়ে লঘু করে দ্রবণের আয়তন এক লিটার কর।

(15) **ফিউসন মিক্সচার :** শুষ্ক সোডিয়াম কার্বনেট এবং পটাসিয়াম কার্বনেটের সমপরিমাণ নিয়ে মেশাও।

(16) **ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ :** 75 গ্রাম $FeCl_3, 6H_2O$ কিছুটা জলে গুলে ফেল এবং তাতে **10** মিলি ঘন **HCl** মেশাও এবং দ্রবণের আয়তন জল মিশিয়ে **1** লিটার কর।

পরিচিত কয়েকটি অ্যাসিড ও ক্ষারের লঘু দ্রবণ প্রস্তুতির উপায়

(1) 5(N) **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড :** 12 (N) ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের 430 সিসি নিয়ে জল দিয়ে 1 লিটার কর।

(2) 5(N) **নাইট্রিক অ্যাসিড :** 16 (N) ঘন নাইট্রিক অ্যাসিডের 310 সিসি ধীরে ধীরে জলে মিশিয়ে মোট আয়তন 1 লিটার কর।

(3) 5 (N) **সালফিউরিক অ্যাসিড :** 36 (N) ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের 140 মিলি ধীরে ধীরে নাড়িয়ে জলে মেশাতে হবে এবং মোট আয়তন 1 লিটার করতে হবে।

(4) 5 (N) **সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড :** 220 গ্রাম বিশুদ্ধ কঠিন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বড়ি জলে ধীরে ধীরে দাও ও ভাল-করে নাড়াও এবং 1 লিটার দ্রবণ তৈরি কর।

(5) 5 (N) **অ্যামোনিয়া দ্রবণ :** 335 মিলি লিকার অ্যামোনিয়া দ্রবণ নিয়ে খুব সাবধানে জল মিশিয়ে 1 লিটার আয়তন কর। লিকার অ্যামোনিয়ার বোতলটি প্রথমে ঠাণ্ডা করে নিয়ে তারপর তার মুখ খুলে ব্যবহার করবে।

দুটি নির্দেশক প্রস্তুতির উপায়

(1) **ফেনপ্থ্যালিন দ্রবণ :** 1 গ্রাম ফেনপ্থ্যালিন 100 মিলি অ্যালকোহলে গুলে নাও এবং তা 100 মিলি জল দিয়ে লঘু কর।

(2) **মিথাইল অরেঞ্জ দ্রবণ :** 0·5 গ্রাম মিথাইল অরেঞ্জ 1 লিটার জলে গুলে নাও।

সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার

বাড়িতে বা ল্যাবরেটরীতে কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

একটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স (First aid box) রাখতে হবে। এই বাক্সে কয়েকটি জিনিস থাকবে। যেমন—ব্যাণ্ডেজ, গজ, তুলো, লুকোপ্লাষ্ট, কাঁচি, সেফটি পিন, কাচের ড্রপার, ভেসলীন, বোরিক অ্যাসিড পাউডার, বার্নল, খাবার সোডা, অগ্নি, নির্বাপক কম্বল (fire proof blanket)। এছাড়া থাকবে—গ্লিসারিন, সারসন তেল, অলিভ তেল, সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের দ্রবণ, মেথিলেটেড স্পিরিট, রেকটিফয়েড স্পিরিট, ডেটল।

কেটে গেলে : কাচে অল্প কেটে গেলে, কাটা স্থান থেকে ভাঙ্গা কাচ (যদি থাকে) বের করে নেবে। এরপর স্পিরিট বা ডেটল দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ক্ষতস্থানে লুকোপ্লাষ্ট লাগিয়ে দেবে।

রক্ত পড়া বন্ধ করতে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ, বা ফিটকিরি বা বরফ ব্যবহার করতে পার। বেশি কেটে গেলে ও রক্ত পড়া না থামলে অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে চলে যাবে।

পুড়ে গেলে : গরম শিখায় বা গরম বস্তুতে হাত লেগে ফোস্কা পড়লে সেই স্থানে বার্নল বা সারসন তেল লাগিয়ে দাও। অনেক ডাক্তার বলেন, আগুনে পুড়লে পোড়া স্থানে জল লাগান উচিত নয়।

যদি অ্যাসিডে কিছু পোড়ে, তবে সে স্থানটি ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে দেবে এবং তারপর ঘন সোডিয়াম বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দেবে এবং শেষে আবার জল দিয়ে ধুয়ে দেবে। এতেও যদি জ্বালাভাব না কমে তবে জায়গাটি নরম কাপড় বা তুলো

দিয়ে মুছে সারসন তেল বা বার্নল লাগিয়ে দাও। যদি সালফিউরিক অ্যাসিডে কোন ক্ষতি হয়, তবে প্রথমে শুকনো তুলো দিয়ে ক্ষতটা মুছে তারপর জল দিয়ে ধুয়ে দেবে এবং আগের মত তুলো দিয়ে জায়গাটা শুকনো করে নেবে এবং তেল বা বার্নল লাগিয়ে দেবে।

যদি সোডিয়াম ধাতু বা ক্ষার লেগে পুড়ে যায় বা ক্ষত হয় তবে সে স্থানটি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দেবে। এরপর **1** শতাংশ অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে দেবে এবং সবশেষে আবার জল দিয়ে ধুয়ে দেবে। তুলো দিয়ে তারপর ক্ষত মুছে বার্নল লাগিয়ে দাও।

যদি ব্রোমিন লেগে ক্ষত হয় তবে পেট্রোল দিয়ে ক্ষতটা ধুয়ে দেবে এবং তাতে ভাল করে গ্লিসারিন লাগিয়ে দেবে। কিছুক্ষণ পর গ্লিসারিন তুলো বা নরম কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে তাতে বার্নল লাগিয়ে দেবে।

আগুন লাগলে ঃ আগুন লাগার হাত থেকে বাঁচতে গেলে সবসময় সাবধানে কাজ করতে হবে এবং অন্যমনস্ক হলে চলবে না। আগুন নেভানোর জন্য হাতের কাছে প্রচুর জল ও বালির বস্তা রাখা প্রয়োজন।

কাপড়ে আগুন লাগলে ছোটাছুটি না করে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে এবং গায়ে গরম কম্বল জাতীয় জিনিস জড়িয়ে দেবে, এতে আগুন নিভে যাবে। জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে শরীরে ঘা দেখা দেবে।

যে সব কারণে আগুন লাগে সে গুলি সম্বন্ধে সাবধান থাকার চেষ্টা করবে। এবং নিচের কথাগুলো সবসময় মনে রাখবে।

(1) ঘরে আগুন লাগলে রান্নার গ্যাস বন্ধ করে দেবে। এবং যেসব জিনিসে তাড়াতাড়ি আগুন লাগতে পারে সেগুলি সরিয়ে দেবে।

(2) কাজ করার সময় যদি কোন বীকার বা ফ্লাস্কে আগুন লাগে তবে সেটি বড় কিছু পাত্র দিয়ে ঢেকে দেবে।

(3) জল ছিটিয়ে বা বালি ছড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। কাঠের কোন জিনিসে আগুন লাগলে জল দিয়ে তা নেভানোর চেষ্টা করবে।

(4) তেল বা স্পিরিটে আগুন ধরলে জল দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করবে না, তাতে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়বে। এই সময় বালি ও খাবার সোডার মিশ্রণ আগুনে ছড়িয়ে দেবে।

বিষাক্ত কিছু মুখে গেলে

যদি কোন বিষাক্ত কিছু মুখে যায় এবং তা যদি গিলে না ফেল, তবে গরম জল দিয়ে মুখ বারবার ধুয়ে ফেলবে এবং সেখানে অলিভ তেল বা ঘি লাগিয়ে দেবে।

যদি কোন পদার্থ পেটে চলে যায়, তবে, সেটি কি ধরনের পদার্থ সেই বুঝে তার প্রতিকার করতে হবে।

অ্যাসিড জাতীয় কোন কিছু খেয়ে ফেললে, বেশি পরিমাণ জল পান করবে এবং কিছুটা চুণজল বা মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া খেয়ে নেবে। কোনরকম বমি করানোর ট্যাবলেট খাবে না।

ক্ষার জাতীয় কোন কিছু খেয়ে ফেললে, বেশি পরিমাণ জল খেয়ে নেবে এবং তারপর একগ্লাস লেবুর জল খেয়ে নেবে। বমি করানোর ট্যাবলেট এক্ষেত্রেও ব্যবহার করবে না।

কোন রকম ভারী ধাতুর লবণ পেটে গেলে, দুধ বা ডিম সেদ্ধ খাবে।

আর্সেনিক বা পারদের যৌগ পেটে গেলে, বমির ট্যাবলেট খাবে এবং নুন জল খেয়ে বমি করবে।

বেশি পরিমাণ কোন গ্যাস নাকে মুখে গেলে

ব্রোমিন বাষ্প, ক্লোরিন গ্যাস, সালফার ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস বেশি পরিমাণে শুঁকে ফেললে অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। তখন রোগীকে উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে আসবে এবং শরীরের জামা কাপড় আলগা করে দেবে। তাকে লঘু অ্যামেনিয়ার গন্ধ শুঁকাবার চেষ্টা করবে এবং খাবার সোডা দিয়ে কুলকুচি করাবে। এরপর ইউক্যালিপটাস তেলের গন্ধ শুঁকাবে।

চোখে কিছু লাগলে

চোখে অ্যাসিড লাগলে চোখে বারবার জলের ঝাপটা দেবে। এরপর 1 শতাংশ Na_2CO_3 দ্রবণের এক ফোঁটা ড্রপারের সাহায্যে চোখে দেবে এবং ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলবে। চোখে ক্ষার জাতীয় কিছু লাগলে,—চোখটি জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেবে এবং 1 শতাংশ লঘু বোরিক অ্যাসিড দ্রবণের এক ফোঁটা ড্রপারের সাহায্যে চোখে দেবে এবং ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলবে। চোখে কোন কিছু উড়ে এসে পড়লে, চোখ ডলবেনা, জলের ঝাপটা দেবে এবং বস্তু কণাটি অন্যকে দিয়ে রুমালের সাহায্যে তুলিয়ে নেবে। এবং আবার চোখে জলের ঝাপটা দেবে।

দোকানের নাম ও ঠিকানা

হাতে কলমে যে সব পরীক্ষা করার কথা তোমাদের বলা হলো, সেগুলি করতে গেলে তোমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি যোগাড় করতে হবে। এর জন্য নিচের ঠিকানাগুলোতে যোগাযোগ করে দেখতে পার।

(1) The Lily & Co,
C41—43 College Street Market, Calcutta-700007 Phone. 34-3056

(2) Bio—Visual praducts,
Zamistanpur, Hyderabad-500048,
Local office—12 Hem Banerjee lane,
Howrah—711102

(3) Nu—Kem Laboratories
10 F Garpar Road, Cal-700009

(4) Alpha metals & Chemicals Company Ltd.
Glass division. Phone 23—9231
7 Red cross Place (3rd Floor), Cal—700001

(5) Bhattacherjee chemicals
85 A, Kaiser Street, Cal—700009.

(6) Oriental Stores Supply Co.
87 A, Chittaranjan Avenue, Cal—700073

(7) Multiscience Corner
13 College Row, Cal-9

(8) B. C. Chatterjee & brothers.
10 Haripaul lane, Cal-6

(9) Chemico (India)
101/B Sitaram Ghose Street, Cal-9

(10) The Bio –Arts.
4 Nilmoni Dutta Lane, Cal—12

(11) Lucky Acid & Chemical works
32/2 Murari pukur Rood, Cal–67

(12) Oster Chemical and Pharmacutical works.
78 B, Manicktala Street, Cal—6.

(13) Science Syndicate.
2 Gansh chandra Avenue, Cal—13

(14) Sisbro Scientitic Instruments.
47-U-A, Jawahar Nagar, Delhi—110007

(15) Indian Scietitic Instruments.
26/116 Dwarka, Sion (East) Bombay—
400022 Ph. 47—6079

———